সেবা

বিশ্ব-বিদ্যালয়

বিশ্ব-বিদ্যালয় কথাটা এ দেশে নূতন। প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও লিল-পত্রে কোথাও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাই না; প্রাচীন অভিধান ও কোষাদিতেও ইহার উল্লেখ নাই। ১৮৫৭ খৃঃ-অব্দে ইউনিভারসিটিস্ আকৃট" বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে নবীনা বঙ্গভাষায়ও বোধ হয় ইহার প্রয়োগ ছিল না। আর থাকিবেই বা কেন? যে পদার্থের অস্তিত্বই ছিল না, তৎপ্রতিপাদক শব্দের প্রয়োগও সম্ভাবিত নহে। অস্মদ্দেশে 'চতুষ্পাঠী', 'বিহার', 'মঠ', 'মাদ্রাসা', ও 'মোক্তাব' ছিল; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে "ইউনিভার্সিটি" ছিল না। বর্ত্তমান ইউনিভারসিটির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য অবলোকন করিয়াই, প্রাচীন নলন্দা, তক্ষশিলা, উদান্তপুর, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিহারগুলিকে আমরা আজ বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা প্রদান করিতেছি। "বিশ্ববিদাঃ" শব্দ সর্ব্বজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত; তাই বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাধিধারিগণ, 'সর্ব্বজ্ঞত্বে'র অভিমান করিবেন না। ইংরাজী Universe শব্দে 'বিশ্ব' বুঝায়; কিন্তু, "ইউনিভারসিটি" শব্দটি ল্যাটিন ইউনিভারসিটাস্ (Universitus) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন এবং তাহা প্রধানতঃ সংসদ্, গোষ্ঠী, ও সম্মিলনের (A Society, a Corporation) অর্থেই ব্যবহৃত হইত। তবে 'বিশ্ব' এই অর্থও যে তদ্দ্বারা দ্যোতিত না হইত তাহা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে "বিশ্ববিদ্যালয়"—বিশ্বের বিদ্যালয় না হইয়া বিশ্ববিদ্যার আলয় বলিয়াই পরিগণিত হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংজ্ঞা—"A universal school, in which are taught all branches of learning."—যে বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যারই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয় তাহাই বিশ্ব-বিদ্যালয়। বিবুধমণ্ডলী নানা বিদ্যা-মন্দিরে সমবেত হইয়া, শিষ্যবর্গকে নানা-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া যে সংসদে সম্মিলিত হন, এবং যে সংসদ্ হইতে সুশিক্ষিত শিষ্যমণ্ডলীকে উপাধি-ভূষিত করেন, সেই সমস্ত পণ্ডিত-সংঘই বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। এই সংজ্ঞানুসারে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজও বিশ্ব-বিদ্যালয় পদ-বাচ্য। প্রাচীন, মধ্য ও বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক সমাজেই কোন না কোন প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল ও আছে। জ্ঞানের পরিধি-বিস্তার ও অজ্ঞানের সঙ্কোচন বা দূরীকরণই সভ্যতার চিহ্ন। কাজেই জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেক সভ্যসমাজে পরিলক্ষিত হইবে।

তবে, দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে জ্ঞানের আদর্শ সর্ব্বদাই বিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ-বিদ্যতে।" তবে, এই জ্ঞান কোন্ 'বস্তু' বা 'বিষয়ে'র, তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। ধর্ম্মশীল, অধ্যাত্মবাদী, অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ভারতীয় ঋষিগণ ও আচার্য্যদের মতে—আত্মজ্ঞানই জ্ঞান এবং অতীব উপাদেয়। আর, কর্ম্মশীল, পার্থিব সুখ-সম্পদ্-অন্বেষণকারী, বাহ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট, পাশ্চাত্য আচার্য্যগণের মতে—জড়বিজ্ঞান, ব্যবহারিক শাস্ত্র, শিল্প ও কলার অনুশীলনই অধিকতর প্রয়োজনীয়। ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাচ্যদেশে ঐ সমস্ত বিষয়ে অনুশীলন ছিল না, কিম্বা পাশ্চাত্য দেশসমূহে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা আদৌ ছিল না বা নাই। দেশ-বিশেষে আদর্শের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, এই মাত্র। আবার সেই পাশ্চাত্য দেশেই মধ্য-যুগের আদর্শ ও বর্ত্তমান যুগের আদর্শে কত পার্থক্য! যখন উক্সতর (Oxford) বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথম সংস্থাপিত হয় তখন বা ইহার কি আদর্শ ছিল, আর বর্ত্তমান কালেই বা ইহার কি আদর্শ!

বেকনের শিক্ষা ও বর্ত্তমান শিক্ষার কত পার্থক্য! ফ্রান্সিস্ বেকন্, ফ্রায়ার বেকনের সমস্ত পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। দ্রব্য ও বস্তু বিশেষের সাহায্যে জীবন ও যৌবন স্থায়ী করার প্রচেষ্টা ও পরশ-পাথরান্বেষণ হইতেই তাৎকালিক রসায়নের

উৎপত্তি। 'আলকেমিষ্টেরাই' বর্ত্তমান 'কেমিষ্ট'। নাগানন্দের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে রসায়নাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বর্ত্তমান যুগের কত আবিষ্কারের সূত্রপাত দেখিতে পাইয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" পাঠ করিলে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। অতএব কাল ও দেশের বিভিন্নতা অনুসারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদর্শে ভারতবর্ষীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং প্রস্তাবিত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে সুধিবর্গের মধ্যে বহু আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে।

উচ্চ শিক্ষাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মূল কথা। মানবের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের যথাযথ উন্মেষ ও বিকর্ষণই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাহিরেও হইতে পারে এবং হইতেছে; কিন্তু, বিশিষ্টরূপে শিক্ষা প্রদানই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। প্রকৃত বিশ্বরূপ এই বিরাট বিদ্যালয়ে সকলেই শিক্ষালাভ করিতেছেন; কিন্তু, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সকলে শিক্ষিত হন না। সামান্য ব্যবহারিক জ্ঞানের অনুশীলন বা অর্জ্জন-স্পৃহার পরিতৃপ্তি অনেক সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে; যে কালের যে উচ্চ জ্ঞান তাহার অনুশীলন, সঞ্চয়, অর্জ্জন ও বর্দ্ধনই বিশেষভাবে

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য ও অভিপ্রায়। যাহা বিশ্বরূপী বিদ্যালয়ে প্রাপ্তব্য, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গমন করা সকল সময়েই আবশ্যক হয় না।

"শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাংগণঃ।
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গোবেদ উচ্যতে ॥"

বেদ, বেদাঙ্গ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রই নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী প্রভৃতি স্থানে অনুশীলিত, অধীত ও অধ্যাপিত হইত। চারিবেদের পঠনা হইত বলিয়া 'চতুষ্পাঠী' নাম হইয়াছে—চতুর্ণাং বেদানাং পাঠো যস্যাম্। তাহা হইতে 'চৌপাড়ী' ও বাখরগঞ্জের 'চৌকাড়ী' শব্দের অভ্যুত্থান। অবশেষে যে স্থানে সামান্য লেখাপড়া হইত, তাহাও 'চৌপাড়ী' শব্দবাচ্য হইয়াছে।

প্রথমে যখন শিক্ষা-বিস্তারের কথা ইংরেজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে উপস্থিত হইল তখন সকলেই জানেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে বিষম মতবিরোধ উপস্থিত হয়। স্যার চার্লস্ উড্ ও লর্ড মেকলে প্রভৃতি মনস্বিগণ এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের তর্কযুদ্ধে যোগদান করেন। শেষে পাশ্চাত্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকদিগেরই জয় হয় এবং এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেই ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় কয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে।

সেবা

অধুনা প্রস্তাবিত হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এবং তদুপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আদর্শ ও মৃতপ্রায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণাম সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

প্রথমে মৃত-কল্প জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাউক। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবল বাত-সন্তাড়িত হইয়া বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজ যখন বিশেষভাবে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, স্বদেশী-আন্দোলন যখন বঙ্গসমাজকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিল, তখন শিক্ষিত সমাজে 'জাতীয়' ভাবে শিক্ষাপ্রচলনের ভাব জাগ্রত হইল; এবং তখন বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 'জাতীয়তার' বিরোধী বা মহাজাতিসংগঠনের পরিপন্থী বলিয়া অনেকেরই ধারণা জন্মিয়াছিল! বলা বাহুল্য—এই ধারণা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত জননায়কগণের মনেই হইয়াছিল। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রকৃতই যদি জাতীয় ভাবোদ্দীপনের বিরোধী হইত, তবে ইহাদের মধ্যে এই আলোচনা কেন? শিক্ষা যে ভাবেই আসুক বা বিস্তৃতি লাভ করুক, যাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাহাদের প্রকৃতি অনুসারেই শিক্ষার ফলাফল লাভ হয়। ভবভূতি বলিয়াছেন—

> বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং তথৈবচ জড়ে
> ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।

ভবতি চ পুনর্ভূয়ানভেদঃ ফলং প্রতিতত্ত্বথা
প্রভবতি শুচিবিম্বোদ্গ্রহেমণির্ন মৃদাংচয়ঃ।

ইংরাজী শিক্ষায় কখনও আমাদিগকে 'ইংরেজ' করিতে পারে নাই বা পারিবে না। তবে যেমন প্রবল বন্যায় স্রোতস্বিনীর জল তটভূমি প্লাবিত করিয়া বহু প্রয়োজনীয় ও রক্ষণীয় দ্রব্য সামগ্রী ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি এই ইংরাজী শিক্ষার প্রবল প্রবাহও আমাদের রক্ষণীয় অনেক বিষয় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। তৎপ্রতি দৃষ্টি দান ও তাহা সংরক্ষণের প্রচেষ্টাই এই জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আন্দোলনে মূর্ত্তিমতী হইয়াছিল। ব্যবহারিক বিদ্যার অনুশীলনও অনুষ্ঠাতৃবর্গের অভিপ্রেত ছিল। রাজনীতির ভীষণ আবর্ত্তে ও রাজপুরুষগণের ভ্রুকুটিতেই এই নবজাত শিশু আজ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। আর যে কখনও ইহাতে জীবনী-শক্তির সঞ্চার হইবে তাহাও সন্দেহের বিষয়।

হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টাও কিয়ৎপরিমাণে এই একই উদ্দেশ্য সংসাধনে প্রযুক্ত।* 'বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রদিগের যোগ্যতা অনুসারে উপাধি বিতরণ করিয়া থাকে; কিন্তু ছাত্রদিগের শিক্ষা ও অধিবাসের কোনই বন্দোবস্ত করে না (They are examining, not

* স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি—
Vide Dacca Rivew.

teaching and residential Universities)। য়ুরোপীয় এবং বিশেষভাবে লণ্ডন ব্যতীত ইংলণ্ডীয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় অধ্যাপক ও অধ্যেতা, শিক্ষক ও ছাত্রদিগের একত্র বাসের কোনই ব্যবস্থা নাই ; সুতরাং ছাত্রগণের চরিত্র সুগঠিত হয় না, অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় ছাত্র-হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ তাই চরিত্র-হীন, মেরুদণ্ডবিহীন, ধর্ম্ম ও নীতিশূন্য, "কিম্ভূতকিমাকার" জীব'।—অনেক দিন যাবৎ রাজপুরুষ ও দেশহিতৈষিবর্গের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি। এই দুরবস্থা অপনোদনের জন্যই ছাত্রাবাস-সমন্বিত, অধ্যাপক-বেষ্টিত, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের এই অভিনব প্রয়াস।

আমরাও মনে করিতেছি যে এবম্বিধ বিশ্ববিদ্যালয়ই অস্মদ্দেশে কেম্ব্রিজ, অক্‌স্‌ফোর্ড, গটিনজেন, বার্লিন, হার্ভার্ড, আপছালা, ভিয়েনা প্রভৃতি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্থান অধিকার করিবে ; বিশেষ, প্রাচীন প্রথানুসারে শিষ্যবর্গের গুরুগৃহ-বাসের মনোমোহন ছবি আমাদের মানস-পটে উদিত হইয়া কতই আশ্বাসিত করে! লোকালয়ের বহু দূরে ঋষি তপস্বীদিগের আশ্রম-ভবনে শিষ্যবর্গ গুরুগৃহে বাস করিয়া ঋষি-চরিত্র ও জ্ঞান লাভ করিবে—ইহা ভাবিতেও আনন্দ হয়। গুরু পিতৃস্থানীয়, গুরুপত্নী মাতৃস্থানীয়া, গুরুপুত্র ও কন্যা সোদর ও সোদরোপমা। ভক্তি ও জ্ঞানের অবিরল

ধারা-পাতে শিষ্যকুল অভিষিক্ত, বিলাস-বাসনা প্রাণে জাগিবার সময় ও সুযোগ নাই, আর্য্য ঋষি-তাপসগণের তপোবনের ছবি, ঋষিপুত্র ও কন্যাগণের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তাঁহাদের অব্যাজ-মনোহর দেহের কত কথাই না মনে পড়ে!

কিন্তু, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিদ্যালয়ে কি মন্বাদি অনুশাসিত গুরুশিষ্যের সেই মধুর সম্বন্ধ, গুরুগৃহ-বাসের সেই ব্যবস্থা বা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু-শিষ্যের একত্রা-বাসের সেই উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইবে? হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা অদ্যাপি অর্থ সংগ্রহেই ব্যস্ত, সুতরাং তাঁহাদের পরি-কল্পিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা এখনও বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সূচনা হইয়াছে তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির পূর্ব্বাভাস কমিসনের রিপোর্টে প্রকটিত আছে।

শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ অধ্যাপকগণ উচ্চ বেতনভোগী। প্রাসাদ-তুল্য সুরম্য ভবনে বাস করিবেন; আর তাহারই অনতিদূরে 'কৃষ্ণ' বা ধূসরাঙ্গ অল্পবেতনভোগী দেশীয় শিক্ষকগণ কেহ কেহ ছাত্রগণসহ বাস করিয়া শ্বেত ও কৃষ্ণের পার্থক্য বিশেষ ভাবে কোমলমতি ছাত্র-হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিবেন। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের উপযোগী লঘু ও স্বল্প বস্ত্র-পরিহিত দেশীয় শিক্ষক ও ছাত্রগণ শ্বেতাঙ্গী গুরুপত্নীদিগের ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্রেক করিবেন।

একত্র এবং গুরুগৃহে ও গুরু সান্নিধ্যে বাসের শুভফলের কথাই আলোচনা করা যাক। ধনী-পুত্র ও নির্ধন ছাত্র, রাজার ছেলে ও প্রজার ছেলে একত্র বাস করিয়া, এক খাদ্য আহার করিয়া এবং এক গুরুর নিকট বিদ্যালাভ করিয়া ধনমদ ও আভিজাত্যের অভিমান প্রভৃতি পরিহার করে, তাহাদের হৃদয়ে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব উদ্রিক্ত হয়, গুরুগৃহে ও গুরুসান্নিধ্যে বাস করিয়া তাঁহারই উচ্চ আদর্শে জীবন গঠিত করিতে সচেষ্ট হয়। সমাজ ও নগরের কোলাহলের বহুদূরে বাস করিয়া সামাজিক পাপ ও ব্যাধির বীভৎস দৃশ্য-সমূহ তাহাদের নয়নপথে উদিত হয় না, তাহারা বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ ও আর্জ্জবাদি রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। তাহারা যে স্থানে বাস করে তাহার জলবায়ু স্বতন্ত্র, জ্ঞানচর্চ্চা ও বিদ্যানুশীলনই তাহাদের একমাত্র কার্য্য; সত্য, জ্ঞান, ও পবিত্রতাই তাহাদের মূলমন্ত্র (Pure atmosphere of study)। কিন্তু, প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—একটি থাকিবে ধনীপুত্রদিগের বিদ্যালয়, একটি থাকিবে কেবল মুসলমানদিগের বিদ্যালয়। ইহাতে সাম্যের পরিবর্ত্তে বৈষম্যের, মৈত্রীর স্থলে বিদ্বেষেরই উদয় হইবে। ধন ও আভিজাত্যের গৌরব যুবক-হৃদয়ে পোষিত হইবে, ধর্ম্ম ও জাতি-বৈষম্য বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইবে। সর্ব্বোপরি শ্বেত ও কৃষ্ণের, জেতা ও জিতের পার্থক্য অন্তেবাসিগণ হৃদয়ঙ্গম করিবে।

আমাদের যুবরাজও সামান্য ছাত্রের সহিত একত্র বাস ও

পানাহার করিতে পারেন, আর এই দরিদ্র দেশের তথাকথিত ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পুত্রেরা সাধারণ ছাত্রদের সহিত একত্র বাস করিতে পারিবেন না! এই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কি প্রকারে সুধিগণের অনুমোদিত হইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।* ঠিক পাশ্চাত্য আদর্শে প্রাচ্যজাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও উন্নতি সম্ভবপর নহে। জাপানবাসীরা স্থূল দৃষ্টিতে অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য রীতি নীতি গ্রহণ করিয়া থাকিলেও প্রকৃত জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করে নাই। এ সম্বন্ধে মনস্বী ওকাকুরা কাকাজু (Okakura Kakusu) বলিতেছেন,—"It is true that the imperative needs of our sudden transformation from the old to the new life, have swept away many landmarks of old Japan, yet in spite of changes we have still been able to remain true to our former ideals; though our sandals be changed, our journey continues; though our houses are burnt, our cities remain; and the earth-quake but shews the virility of the mighty 'fish' that upholds our island empire." 'অকস্মাৎ পুরাতন ছাড়িয়া নূতন ভাবে জীবন পরিচালনা করার প্রয়োজনে প্রাচীন জাপানের অনেক প্রাচীনতর চিহ্ন বিলুপ্ত

* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে লর্ড কার্মাইকেলের বক্তৃতায় জানা গেল, সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কলেজের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই।—লেখক।

হইয়াছে সত্য বটে ; কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তনে আমরা প্রাচীন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হই নাই। যদিও আমাদের উপানহ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকুক তথাপি আমাদের গতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই ; আমাদের গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া থাকিলেও নগরগুলি বর্ত্তমান আছে এবং মুহুর্মুহু ভূকম্পনে যে মৎস্য আমাদের এই দ্বীপসাম্রাজ্য বহন করিতেছে, তাহারই বলবীর্য্য প্রকটিত করিতেছে'। অন্যত্র বলিতেছেন— "We shall be ready more than ever to learn and assimilate what the west has to offer, but we must remember that our claim to respect lies in remaining faithful to our own ideals." অর্থাৎ, 'পাশ্চাত্য দেশ-সমূহ আমাদিগকে যেটুকু বিদ্যা ও জ্ঞান প্রদান করিতে পারে তাহা গ্রহণে ও আয়ত্তীকরণে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রস্তুত থাকিব ; কিন্তু ইহা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে আপন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপরেই আমাদের প্রকৃত সম্মান ও শ্লাঘা নির্ভর করে'।

অপেক্ষাকৃত নবীন জাপানের শিক্ষায় যদি এই মূলমন্ত্র হয়, তবে প্রাচীনতম ভারতের শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত?—আপনারাই বিবেচনা করিবেন। আমরা প্রাচীন আদর্শ হইতে কি প্রকারে বিচ্যুত হইতেছি তাহা এই সামান্য বিষয়ের আলোচনাতেই পরিস্ফুট হইবে।

প্রাচীনকালে শিক্ষক ও অধ্যাপকবর্গ শিক্ষার্থীর নিকট অর্থ

গ্রহণ করিতেন না ; পরন্তু অন্নবস্ত্র ও বাসস্থান দিয়া শিক্ষার্থীদিগের সাহায্য করিতেন ; অদ্যাপি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের মধ্যে এই প্রাচীন প্রথার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ ও ধুরন্ধরেরা পূর্ব্বকালে শিক্ষকসমাজ ও অধ্যাপকদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাকার্য্যের সহায়তা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীর কি প্রকার অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। কোথায় সেই সরল জীবন ও উচ্চচিন্তনের (Plain living and high thinking'এর) আদর্শ, আর কোথায় এই সহস্রমুদ্রাবেতনভোগী, ভোগবিলাসপরায়ণ য়ুরোপীয় শিক্ষক ও অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত !

ঋষিকল্প স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'A Few Thoughts on Education' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :— "There was a time when teaching was considered the highest work of man and was almost entirely gratuitous. But that was so mainly because the knowledge most sought for, was spiritual knowledge, the cultivation of which made its Professors indifferent to their temporal wants, and partly also because men of wealth and rank vied with one another in honouring the learned and removing their wants." এদেশে এমন একদিন ছিল যখন অধ্যাপনাই মানবের উচ্চতম ব্রত বলিয়া পরিগণিত হইত এবং বিদ্যাদানে অর্থলাভের

কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিত না। এই অবস্থার কারণ—অধ্যাত্ম-বিদ্যাই তখন বিশেষ লোভনীয় ছিল; এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানদাতৃগণ পার্থিব বিষয়ে অনেকাংশে উদাসীন ছিলেন এবং ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিরাও পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্মান প্রদর্শনে ও তাঁহাদের অভাব দূরীকরণে পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতেন। ইহাও আংশিক ভাবে উপরোক্ত অবস্থার কারণ ছিল।'

শিক্ষার কথা মনে হইলেই শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। শিক্ষা করিতে হইলেই শিক্ষকের আবশ্যক। ইংরেজেরাও বলেন যে, শিক্ষিত ভারতবাসীর সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্য জীবন গঠন সমীচীন নহে। সুতরাং, পাশ্চাত্য শিক্ষক বা অধ্যাপকদিগের জীবন কদাপি আমাদের আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না। যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিতে পাশ্চাত্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা থাকুক, তবু যে শিক্ষকজীবন শিক্ষার্থীর আদর্শস্থানীয় হইবে তাহা কখনও পাশ্চাত্য হইলে চলিবে না।

অতএব, ঠিক Residential University'কে আমাদের মঙ্গলকর করিতে হইলে উপযুক্ত দেশীয় শিক্ষক ও অধ্যাপকের দ্বারা তাহাকে বিমণ্ডিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করেন বটে, কিন্তু ছাত্রজীবনের উপর তাঁহারা যৎসামান্য রেখাপাত করিতেই সক্ষম হন। গৃহে, সমাজে ও বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্র-

বৃন্দ সর্ব্বতোভাবে প্রাচ্যভাবে অনুপ্রাণিত থাকেন, কিন্তু এরূপ Residential University'তে শিক্ষার্থীরা গৃহ ও সমাজের 'আব্‌হাওয়া' হইতে নিশ্চিতই বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হইবেন।

নব নব বিদ্যালয় সংস্থাপনের পূর্ব্বে এই শিক্ষকসমস্যার মীমাংসা হওয়া উচিত। যে দেশে শিক্ষার সম্মান আছে সেই দেশেই শিক্ষার আদর। যে দেশে শিক্ষক ও অধ্যাপক উপযুক্তরূপে সম্মানিত ও পূজিত হন না, সে দেশে শিক্ষাবিস্তারের আশা দুরাশা মাত্র। দরিদ্র শিক্ষকবর্গ যেখানে ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পূজার্হ নন, সে দেশে বিদ্যার আলোচনা ও সারস্বতীর সাধনা অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সহস্র সহস্র যুবক উপাধি-ব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া সমাজে বিচরণ করিতেছেন ;—তন্মধ্যে কয়জন শিক্ষাপ্রদানের, শিক্ষার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার গুরুত্ব, মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন? অল্পবেতনভোগী, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত শিক্ষক-জীবন যাপন করিবার জন্য কয়জন উৎসুক? সহস্র সহস্র যুবক বিষয়ের পূতি-গন্ধপূরিত জীবনকে শিক্ষক-জীবন হইতে শ্লাঘ্যতর মনে করেন। আবার শত শত কৃতবিদ্য যুবক শিক্ষাবিভাগ ব্যতীত রাজকীয় অন্যান্য বিভাগে চাকুরীর জন্য লালায়িত। "স্কুলমাষ্টারী" এদেশে একটা উপহাসের ব্যাপার। যতদিন এ ভাব এই অধঃপতিত দেশ হইতে তিরোহিত না হইবে ততদিন শিক্ষা-বিস্তারের প্রসঙ্গ প্রলাপোক্তি মাত্র! তবে যেমন প্রত্যেক জলদমালার প্রান্তভাগে সৌদামিনীর

রজতরেখা প্রতিভাত হয়, তেমনি এদেশেও কোন কোন আচার্য্যের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল রেখাপাতে আমাদের নিরাশা-নীরদাচ্ছন্ন অন্তর সময়ে সময়ে প্রোদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পুণার 'ফারগুসান' কলেজের অধ্যাপকগণের কথা স্মরণ করুন, প্রথিত-যশাঃ অধ্যাপক গোখ্‌লে, রাজদণ্ড প্রপীড়িত মহামতি তিলক, জগদ্বিখ্যাত পরাঞ্জপে প্রভৃতি দারিদ্র্য-মহিমায় মণ্ডিত হইয়া শিক্ষক ও অধ্যাপকের প্রাচীন আদর্শ কিয়ৎপরিমাণে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। পরলোকগত অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অদ্যাপি ভারতীয় অধ্যাপকের উজ্জ্বল আদর্শে দীপ্যমান রহিয়াছেন! আমাদের অশ্বিনীকুমার ও শ্রীমান নৃত্যলালও যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া স্বীয় স্বীয় প্রবর্ত্তিত ব্যবসায় ও পদ পরিত্যাগ করিয়া রাজসম্মান ও অর্থ-লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ-যোগ্য। স্যার গুরুদাস বলিয়াছেন,—"The state, therefore, should accord to the teaching profession due rank and adequate emoluments; and modern society, instead of measuring the worth of a man by the wealth he can earn, should shew ill-ermunerated teachers the respect which is their due, if it cares for the welfare of future generations of men which must depend largely upon the efficient teaching of

the present generation of boys."—'শিক্ষা-ব্যবসায়ী-দিগকে উপযুক্ত মর্য্যাদা ও পারিশ্রমিক দেওয়া গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য, এবং ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের মঙ্গল (যাহা বর্ত্তমান বালক ও যুবকদিগের উপযুক্ত শিক্ষার উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে) আকাঙ্ক্ষা করিলে, আধুনিক সমাজের লোকের মহত্ত্ব, তাহার অর্থোপার্জ্জন-ক্ষমতার মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ না করিয়া, অল্প-বেতনভুক্ শিক্ষকদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনেই নিদ্ধারিত হওয়া কর্ত্তব্য।' যদি আমরা দেশের মঙ্গলের কথা কিয়ৎপরিমাণেও চিন্তা করিয়া থাকি, এবং সেই মঙ্গল-লাভের চেষ্টাই যদি প্রকৃত স্বদেশহিতৈষণা হয় তবে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তারকল্পে সর্ব্বপ্রকারের কার্য্যকরী শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। আর, শিক্ষার বিস্তার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত শিক্ষকের উপরই নির্ভর করে। অর্থের অভাবে শিক্ষা-বিস্তারের পথ অবরুদ্ধ থাকিবে না। গোখ্‌লের "অবৈতনিক ও বাধ্যকর প্রাথমিক শিক্ষা" বিষয়ক প্রস্তাব আমার মতে অর্থের অভাব নিবন্ধনই অগ্রহণীয় নহে,—উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবেও ঐ প্রস্তাব সহসা ভারতের কোন প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধেও সেই কথা।

যে দিন আমাদের সুশিক্ষিত, চরিত্রবান্ যুবকেরা শিক্ষক-জীবনকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বদেশ-হিতৈষণার ও স্বদেশ-

প্রীতির আদর্শ জীবন বলিয়া মনে করিবে, যে দিন শত শত যুবক সুলভ অর্থাগমের মায়া কাটাইয়া, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত শিক্ষকতার পুণ্যব্রত গ্রহণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবে সেই দিনই এদেশে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের কার্য্য আরব্ধ হইবে।

যে শিক্ষকদিগের শিষ্যমণ্ডলীর সহিত সহানুভূতি ও সমবেদনা নাই, যাহাদিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ ছাত্রদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যাহারা জেতৃত্বের অভিমান পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় ছাত্রবর্গকে স্থাপন করিলে কোনই শুভ ফললাভের আশা নাই। বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার জন্য য়ুরোপীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয় করুন ; কিন্তু তাঁহারা কদাপি আমাদের পরিকল্পিত "গুরুর" স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না।

জনক জননী, ভ্রাতা ও ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও বান্ধবের স্নেহ-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া, 'হোষ্টেলে' বাস করিলেই কি যুবক ও বালকদিগের চরিত্র স্পৃহণীয় হইয়া উঠিবে ? ছাত্রাবাসে (Mess'এ) বাস অপেক্ষা উপযুক্ত অভিভাবকের অধীনে কোন হোষ্টেলে বাস বাঞ্ছনীয় হইতে পারে ; কিন্তু যে স্থলে গুরুর কৃপা-দৃষ্টি নাই, গুরু-পত্নীর আদর নাই, সেই স্থান কি স্ব-গৃহ হইতে বালক বা যুবকের বাসের পক্ষে অধিকতর উপযোগী ?

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

সমাজ-তত্ত্ব

মানুষ কতদিন।

সম—অজ+ঘঞ হইতে সমাজ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার সাধারণ অর্থ দল। বহু লোকের স্বার্থ বা লক্ষ্য একদিকে কেন্দ্রীভূত না হইলে দলসংগঠিত হইতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের উপকার করিব, এই বিশ্বাসে যে অতি বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে থাকে, তাহার নামই দল বা সমাজ। সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার দিকে সমাজের ন্যায় নিরপেক্ষ ও সুতীক্ষ্ণ দ্রষ্টা আর নাই। সমাজের কথা চিন্তা করিলে মানবের প্রাণ যেন কেন অসীম ভাব হইতে অসীমত্বে ছুটিয়া যায়, ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতার কল্পনা মন হইতে অপসারিত হয়, সাগরোদ্দেশে নদী-প্রবাহের ন্যায় মানবের ব্যষ্টিত্ব সমাজরূপ সমষ্টি-জলধিতে ডুবিয়া যায়। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের রূপান্তর, বাষ্প যেমন জলের ঘনীভূতাবস্থা, ব্যক্তি মাত্রই তেমন সমাজ-শরীরের অঙ্গ-বিশেষ। এ হেন সমাজ বাক্যটি গূঢ়ার্থবোধক। দেখা যাউক, উহার সারতত্ত্ব আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি কি না। পরস্পর পরস্পরের উপকার করিব, এই চুক্তিই যদি সমাজের উদ্দেশ্য হইল, তাহা হইলে এরূপ উদ্দেশ্য সাধনের বাসনা মানব মনে কখন্ বিকাশ হইয়াছে?

ইতিহাস মনুষ্য সৃষ্টির বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয় তাহা ভ্রম-পূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। ইতিহাস বলে, মনুষ্যের সৃষ্টি তিনি চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে নহে; ইতিহাস অপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থ অনেকটা ভ্রমশূন্য বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যেও বাইবেল ও কোরাণ অপেক্ষা হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র যে অধিকতর প্রাচীন, তাহা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু উহা পাঠ করিয়াও আমরা এই জটিল বিষয়ের কোন মীমাংসা করিতে পারি না। হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থও প্রাচীনের গাঢ়তম অন্ধকারে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ঋক্‌বেদ পাঁচ ছয় সহস্র বৎসরের মনুষ্যের পরিচয় দেওয়ার স্পর্দ্ধা করেন। প্রকৃতই কি ইহার পূর্ব্বে মনুষ্য ছিল না? ক্ষীরোদ-বাবুর "মানব-প্রকৃতিতে" বিবর্ত্তবাদীদের যে মত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে বেশ অনুমিত হয় যে, ইতিহাস ও ঋক্‌বেদ মনুষ্যের আদিম সৃষ্টির যে প্রমাণ দেয় তাহা ভ্রমশূন্য নহে। উহার পূর্ব্বেও মনুষ্য ছিল, কিন্তু সমাজবদ্ধ ছিল কি না তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তবে কখন্ সমাজের সৃষ্টি হইল?

সমাজের প্রথম অবস্থা।

আর্য্যগণ যখন উত্তর কুরুবর্ষে বাস করিত, তখন তাহারা জনসংখ্যায় সামান্য না থাকিলেও, তাহাদের আচার ব্যবহার নিতান্ত ঘৃণ্য ছিল। উহাদের তখন মৃগয়ামাত্র উপজীবিকা ছিল এবং অরণ্যচর হইয়া উহারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাকিত। ক্রমশঃ বাসস্থানের অভাব

হওয়ায় ঐ আর্য্যগণ বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, যে স্কান্দিনেবীয়, টিউটন, রোমক, পারসিক প্রভৃতি অপরাপর বহুতর জাতি এই আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। উহারা মৃগয়ালব্ধ মাংসে উদরপূর্ত্তি করিত ; কাজেই উহা মনুষ্য সমাজের প্রথম অবস্থা। মৃগয়ায় প্রত্যহ সফলকাম হওয়া কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নহে। উহারা মৃগয়ার অভাবে উপবাস-যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য পশুপালন আরম্ভ করিল। জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ মনুষ্যের পশুপালন মনুষ্যসমাজের দ্বিতীয় অবস্থা। পশু-পালনের পর উহারা শস্যাদি রোপণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় হইতে উহাদের মনে পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রবল হইল ; কারণ মৃগয়া ও পশুপালন অপেক্ষা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহে পরস্পরের সাহায্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই কৃষিকার্য্যের সময় ভূমির স্বত্ব ও উহার পরিমাণ সকলের মধ্যে সুস্থির রাখার জন্য কতকগুলি বিধি-বদ্ধ নিয়মাবলীর আবশ্যক হইল। স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত সকলেই সেই নিয়মাবলীতে বাধ্য হইল। ত্যাগ ভিন্ন আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি হয় না। সমাজের প্রথম অবস্থায় আর্য্যসন্তানেরা তিতিক্ষার পরিচয় না দিয়া স্বার্থরক্ষার দিকে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। বহিঃ-প্রকৃতির প্রভাব তাঁহাদের চরিত্রকে অনেক সময় বিপথগামী করিত। এই সময় হইতে আর্য্যসন্তানেরা সমাজের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে শিখিলেন।

আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যজীবন-গঠনে সমাজ পরম সহায়। মনুষ্য জন্মধারণ করিয়া মনুষ্যের সাহায্যে উপযুক্ত সময় কথা বলে, মনুষ্যের ন্যায় চিন্তা করে, কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বা অননুষ্ঠেয় তদ্বিষয়ে মনুষ্য কর্তৃক উপদিষ্ট হয়। মোটের উপর সে যতকাল অপর লোকের সঙ্গে মিশামিশি করিয়া একযোগে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে না পারে, ততকাল সে সংসার-স্থান লাভের নিমিত্ত অপরের ভাব ও অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের ন্যায় শিক্ষিত ও চরিত্রবান হইতে চেষ্টা করে। এক কথায় মনুষ্যে যাহা কিছু মনুষ্যত্ব তাহাই সে মনুষ্যের নিকট শিখিয়া লয়। মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব যদি সাম্প্রদায়িকত্ব হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সে কাহার উৎসাহে উচ্চ বৃত্তিগুলির অনুশীলনে সমুৎসাহিত হইতে পারে? কেই বা তাহার গুণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়? সমাজের নিকট মনুষ্য এত উপকৃত যে, সে যদি সেই উপকার লাভে বঞ্চিত হইত, তাহা হইলে বন্য পশু ও তাহার মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইত না। যদি বলা যায় যে, মনুষ্যের যাহা কিছু যুক্তি, শক্তি ও মানসিক গতিপ্রবণতা দেখা যায়, উহা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত, পূর্ব্বপুরুষগণের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে ইহাই পাওয়া যায় যে, সেই শক্তিবিকাশেও সমাজ তাহার অসাধারণ হিতৈষী ছিল।

সমাজের উপকারিতা।

সুতরাং মনুষ্যের সঙ্গে সমাজের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে।

সমাজ মনুষ্যহৃদয়ের উপর এত আধিপত্য বিস্তার করিলেও সাম্প্রদায়িকতা সমাজ গঠনের ও উন্নতির পরিপন্থী। অনেক সময় সাম্প্রদায়িকতায় যথার্থ মত প্রচারিত বা পরিগৃহীত হয় না। ইহাও দেখা যায় যে, দুর্ব্বল সম্প্রদায় কোন একটি সত্য আবিষ্কার করিয়া তাহা জীবনে বা কার্য্যে প্রায়ই প্রতিফলিত করিতে পারে না। উহা যদি প্রবল সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী হয়, তাহা হইলে উহারা সত্যপ্রিয় নিঃস্ব সম্প্রদায়ের হৃদয় হইতে সত্যের আদর্শ মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে; যদি প্রত্যেক সম্প্রদায় সত্যরক্ষণে বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে সমাজের ভিত্তি কি সুদৃঢ় হইতে পারে? সত্যই সমাজ-দেহের প্রাণ। যদি সমাজকে সংস্কারপ্রভাবে সকলের শ্রদ্ধেয় করার আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে সত্য নির্ণয়ের জন্য সকল সম্প্রদায়েরই অল্প বিস্তর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজের যাঁহারা অন্ধ-বিশ্বাসী অর্থাৎ ধর্ম্ম, নীতি ও চির-প্রচলিত প্রথাগুলির সত্যানুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল নিয়মানুবর্ত্তনে সকলকে প্রোৎসাহিত করেন, তাঁহারা কদাচিৎ দেশহিতৈষণার যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু তাঁহাদের শাসনাধীনে বাস করিয়া লোকে স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ করিতে না পারিয়া মনুষ্যত্বহীন

লোকের সমাজ-শরীরের অঙ্গ বিশেষ।

হইয়া পড়ে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, বহু লোক যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করেন, তাহাই চিরন্তন সত্য; তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কাহাকেও তর্ক বিতর্ক করিতে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। সমাজের কোন প্রশ্নে সত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সাম্প্রদায়িক মতের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। অনেক সমাজে এরূপ মনীষী জন্মিয়াছেন, যাঁহার মত প্রথম গৃহীত না হইলেও শেষে সত্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের কথা স্মরণ করিলে এ বিষয়ের সমর্থনোপযোগী অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। উদাহরণ-স্থলে ভাস্করাচার্য্য ও গ্যালিলীওর নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদ্বয়ের মত তাৎসাময়িক লোক গ্রহণ না করিলেও আমরা কি উহাদের বাক্য অধুনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি না? ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে একটা নূতন সত্য পাইলে অনেক সময় সে সমাজস্থ লোকেরা বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলি, কেবল অধিকাংশ সাময়িক মতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সমাজ যদি সত্যের প্রতি দৃষ্টিশালী হইত, তাহা হইলে অসময়ে ইউরোপ পণ্ডিতাগ্রগণ্য সক্রেটিশকে হারাইত না। ভারত শতাব্দী বসিয়া যে শিক্ষা করিয়াছে, তাহা বোধ হয় ২।১ মাসে শিখিয়াই উন্নত হইতে পারিত। বহু লোকের মতের বিরুদ্ধে যখন কোন লোক দাঁড়ায়, তখন তাহাকে উপহাস না করিয়া, পরাধীন করিতে না চাহিয়া, তাহার স্বাধীন মত সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারের সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি

উহার মত ভ্রমপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সে মত নিয়া অনেক সময়ে সে আন্দোলন করিতে পারে না। যখন সমাজের একটি লোকের অভ্রান্ত মতের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় জীবনের উদ্ধার হয়, তখন সমাজের ব্যক্তিমাত্রই যে আশাস্বরূপ, হিতসাধনক্ষম, উদ্ধার-কারী তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই জন্যই বলিতে হয়, লোকমাত্রই সমাজের অঙ্গ স্বরূপ, উহার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে সমাজের বিশেষ সম্পর্ক আছে। সত্যের প্রতি অনাদর বা সত্য আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য না রাখায় অনেক সমাজ উন্নতি-সাধনে বিমুখ হইয়াছে।

কিরূপে সত্য আবিষ্কৃত হয়।

জগৎ যে ক্রম-বিকাশের প্রভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, জাগতিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই এই সার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। যাঁহারা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, সত্যানুশীলনে তৎপর, তাঁহাদের অসাধারণ কার্য্যাবলীর বিষয় একটু আলোচনা করিলেই বোধ হয় যে, তাঁহারা যেন জগতের গতি পরিণতির দিকে পরিচালিত করার জন্যই ধরাতলে আবির্ভূত হয়েন। যখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম এ দেশের লোকদিগকে সত্য গোপন করিয়া কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আনুষ্ঠানিক ব্রতে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, তখন বোধিদ্রুমের মূলে কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিরত হইয়া যোগিরাজ শাক্যসিংহ জ্ঞানালোকে উদ্বুদ্ধ হইলেন, এবং সাধারণ্যে মহাসত্য

প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিলেন। যখন রোমের পোপ যিশু-প্রচারিত অপূর্ব্ব ধর্ম্মকে ক্রীড়া-কন্দুক মনে করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিতেছিলেন, তখন প্রাণপণে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া নির্ভীক লুথার ইউরোপে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম প্রচার করিয়া, শত শত লোককে পাপ পথ হইতে পরিত্রাণ করিয়া ধন্য হইলেন। সত্যসাধনে ও সত্য প্রচারে উক্ত সত্যপ্রাণ মহা-পুরুষদ্বয় কি আন্তরিক অনুরক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যাহারা সর্ব্বদা সত্যের লঙ্ঘনে তৎপর, তাহাদের আচরণে যে জাগতিক কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা জ্ঞানাবতার বুদ্ধ ও লুথারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিলেই বোধগম্য হইবে। যেখানে সাম্য সেইখানেই সত্য বিরাজমান, কিন্তু বৈষম্য সংসারের একটা অপরিহার্য্য নিয়ম। ধনবৈষম্য, শক্তি-বৈষম্য, আরও কত বৈষম্য। এই বৈষম্যের ফলে সত্য চাপা পড়িয়া যায়। যেখানে শক্তিমান স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সত্য গোপনে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, সেখানে সমাজ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সমাজস্থ লোক সৎপথে পরিচালিত হইয়া স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ করিতে পারে না। তাহারা যুক্তি ও তর্ক দ্বারা যাহা চিরন্তন সত্য বলিয়া ঠিক করেন, তাহা সত্য হইলেও কে তাহা সাদরে গ্রহণ করে? সমাজের এক শ্রেণীর লোক যদি অপর শ্রেণীর দ্বারা নিগৃহীত ও উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে সমাজের সজীবতাও কেহ আশা

করিতে পারে না। যতকাল শক্তিমান বিষয়-বিশেষে শক্তিহীনেরও সারবত্তা স্বীকার না করিবেন,—সামাজিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত মন্তব্য সমাজদেহ পরিপুষ্টির সহায়ক বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত না হইবেন, ততকাল সমাজের কোন মতই জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী ও নিঃসংশয় ভাবে ক্রিয়া করিবে না। আধ্যাত্মিকতা বাড়িলেই লোকের সত্যের প্রতি আসক্তি জন্মে।

আসুরিক শক্তি সমাজকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি সমাজকে উদ্ধার করিয়া থাকে। বিভিন্ন বিভাগ রক্ষার্থ উভয় শক্তিসম্পন্ন লোকই সমাজে প্রয়োজনীয়। কিন্তু আসুরিক শক্তি যদি আত্মরক্ষার হেতু না হইয়া পরের অধিকার ও পরের আধ্যাত্মিক শক্তি খর্ব্ব করিতেই উদ্যত হয় তাহা হইলে সেই আসুরিক শক্তিতে সমাজ লয় প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন গ্রীসে বলবীর্য্যশালী স্পার্টাগণ (Sparta) শক্তিমদে প্রমত্ত হইয়া যখন অপরের উপর অবৈধ উৎপীড়ন করিতে লাগিল, তখন সমাজের আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাদিগকে পরাভূত করিতে না পারাতে অধর্ম্মাচরণের ফলে দুর্দ্ধর্ষ স্পার্টাগণ সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছিল। স্পার্টা সৈন্য যদি আধ্যাত্মিক শক্তিবলে নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে গ্রীসের মস্তক অসময়ে হেঁট হইত না। কর্ম্মক্ষেত্রে স্পার্টাদের ঐ আসুরিক শক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়

আসুরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি।

হইয়াছিল বলিয়াই স্পার্টাগণ গ্রীসীয় সমাজে নিন্দনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে সমাজে বলবীর্য্যসম্পন্ন লোকের একেবারেই প্রয়োজন নাই, এ কথা বলা চলে না। যে সমাজে ঐ উভয় শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ লোকচরিত্রে পরিস্ফুট হয় না, সে সমাজের দুর্দ্দশা এরূপই হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র সমরে যোদ্ধৃদলের ভিতর ঐ উভয় শক্তির যে একত্র সমাবেশ দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। সে শক্তি প্রকৃতই বিস্ময়কর ও সকল সমাজস্থ লোকের অনুকরণীয়। মনোবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা সত্য হইতে অধিকতর সত্যে প্রবেশ করা উহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

মনোবৃত্তির অনুশীলন।

সত্যানুসন্ধিৎসায় শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ জন্মায়। সমাজস্থ লোকের চিত্ত কি উপায়ে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। আমাদের মনোবৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যদি শারীরিক বৃত্তিও বৈধভাবে পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে কেবল সত্যের প্রতি আসক্তি কেন, আমরা সত্যরক্ষার্থ সহস্র বিপদকে আলিঙ্গন করিতে পারি। সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণক্ষম হওয়াই কেবল আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। সত্যস্বরূপ ভগবানের রাজ্যে যাহাতে সত্যেরই প্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ সাধনায় ব্রতী হওয়া সমাজস্থ লোকের প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা যখন কোন

বস্তুকে সুন্দর বলি, তখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে একটি সৌন্দর্য্যের আদর্শ আছে, সেই আদর্শের সঙ্গে প্রাগুক্ত সৌন্দর্য্যের আদর্শ তুলনা করিয়া যদি সেই আদর্শানুরূপ উহা দেখিতে পাই, তাহা হইলেই উহাকে সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। সেই-রূপ সত্যেরও একটা আদর্শ আমাদের মনে বর্ত্তমান থাকে। কোন একটা বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণের সময় সেই বিষয়গুলি ভাগ ভাগ করিয়া যাহা পাই, তাহার সঙ্গে আদর্শের তুলনা করিয়া সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। উপনিষদ্ বলেন—ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। ইহা হইতে এই ঠিক হয়, যে ঈশ্বরে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার পক্ষে সত্য-নির্দ্ধারণ তত সহজ ব্যাপার। জাগতিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও বোধ হয়, জগৎ ক্রমশঃ ভগবানের অভিপ্রেতউন্নতির দিকে চলিয়াছে ;—তাহাকে পরিণতির দিকে পরিচালিত করা জগদীশ্বরের একটা অভিপ্রায়। মিথ্যা দ্বারা যখন সে অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারে না তখন মিথ্যা যে ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধ তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি! যাঁহারা মিথ্যাবর্জ্জন ও সত্যগ্রহণে উৎসাহদাতা, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত হিতৈষী। মন যখন উচ্চ আদর্শের প্রতি সঞ্চালিত হয়, তখনই মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, মিথ্যা বস্তুর তৃষ্ণা অসার বলিয়া বোধ হয়। সমাজের প্রত্যেক লোক উচ্চ আদর্শের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিলেই সমাজস্থ লোকচরিত্রে বলবীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখা যাইতে পারে। কারণ,

উভয় দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উচ্চাদর্শের সন্মুখীন হওয়া সম্ভব নহে।

সত্যানুসন্ধিৎসা।

সমাজের অনেকে প্রাচীন আচার ও রীতিগুলির প্রতি এত শ্রদ্ধাপরবশ যে, উহার ভিতর কতটুকু সত্য আছে, তাহা বিচার না করিয়া তদনুশীলনে বিশেষ আনুরক্তি প্রদর্শন করেন। ঐগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা উহাদের প্রবর্ত্তক তাঁহারা সাময়িক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কতকগুলি আচার ও রীতি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের কতকগুলি যে পরিবর্ত্তনীয় তাহা রীতিনিষ্ঠ ও আচার-পরায়ণগণ স্বীকার না করিলেও সমাজের গতিই উহার সাক্ষ্য দিতেছে। প্রাচীন কালের রীতি-নীতির উপর বিশ্বাসস্থাপন প্রশংসার্হ। কিন্তু প্রাচীন রীতিনীতির অনুসরণের মূলে জ্ঞান থাকা চাই। মনুষ্য ভ্রমসঙ্কুল, কিন্তু তাহা হইলেও সকল লোকেরই বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হয়। এই বিচার দ্বারা সম্যক সত্য প্রকটিত না হইলেও, যতটুকু আবিষ্কৃত হয় তাহা পরবর্ত্তী লোকের পথপ্রদর্শক হইয়া দাঁড়ায়।

কোন কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদের দেশীয় লোক অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহাতে যোগদান করেন না। বোধ হয় প্রাচীন কালের ঋষিবাক্যে ইহাঁদের শ্রদ্ধা বড়ই বলবতী। তাঁহাদের

বাক্য তর্কবিতর্ক করিয়া বুঝিয়া লওয়া উহাঁরা পণ্ডশ্রম মনে করেন। অন্তশ্চক্ষুসম্পন্ন ঋষিগণ আজকাল যখন সমাজের নিয়মসংস্থাপক নহেন, অথচ সমাজসংক্রান্ত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যখন একান্ত আবশ্যক, তখন উহা সময়োপযোগী করার জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের লোকেরও আন্দোলন ও চর্চ্চায় যোগদান করা উচিত।

মৌলিকতা।

যে সমাজস্থ লোক অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়, সে সমাজস্থ লোকের ভিতর ঐক্যবন্ধন থাকিলেও তাহারা পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। ভারতের ইতিহাসে এমন অনেক কুসংস্কারমূলক ঘটনার সাক্ষ্য দেয় যে, উহা যথোপযুক্ত তর্কবিতর্কের অভাবে শ্রেণীবিশেষের হৃদয়ে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, উহার বিষময় ফলে অনেক লোকের শান্তিও অন্তর্হিত হইয়াছিল। সকলে একটা নির্দ্দিষ্ট রীতি আশ্রয় করিলে লোকচরিত্র এক ছাঁচে ঢালা যাইতে পারে বটে। কিন্তু সমাজের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য—লোকমাত্রকে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি প্রদান। এই সত্য নানা কার্য্যে নানা রূপ চিন্তায় উদ্ভাবিত হইতে পারে না কি? সমাজের স্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখিলে, বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন কার্য্যসাধনের অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিভিন্নতা লোকচরিত্র একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কার কারণ নাই। মৌলিকতা মনুষ্য-চরিত্রের প্রধান

ভূষণ। যেখানে একই আচার সকলের অবলম্বন হয় সেখানে মৌলিকতা পরিস্ফুট হইতে পারে না। প্রত্যেক লোকই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য মাত্রকে প্রকৃতির অনুকূল কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত। উহার ফলে যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। বিভিন্ন ব্যবসায়ে জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইলে, এক দিকে যেমন সমাজের আচার লঙ্ঘিত হয়, অপর দিকে তেমনই চরিত্রের মৌলিকতা প্রকাশ পায়। সমাজদেহের পরিপুষ্টি ব্যক্তিগত মৌলিকত্বের উপর যতটা নির্ভর করে, ততটা আচারানুবর্ত্তনের উপর নহে।

বর্ণবৈষম্য।

শুনিতে পাই বেদে বর্ণ-বৈষম্যের কথা নাই। এই বর্ণ-বৈষম্যের কথা বেদে না থাকিলেও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। বেদে যাহা নাই তাহাই যে সমাজ-শরীরের প্রতিকূলাচরণ, এ কথা স্বীকার করা যায় না। যাঁহারা ঐ বর্ণ-বৈষম্যের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা চরিত্রের মৌলিকত্বের উপর বড়ই দৃষ্টিশালী ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয়ের উৎপত্তির কারণ চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, যাঁহারা ঐ সময় বিশেষ বিশেষ :কার্য্যে বিশেষত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারাই গুণানুসারে এক এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সময় নিশ্চয়ই উহাদের চরিত্রগত মৌলিকত্ব নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া

উহাদিগকে যোগ্যতানুসারে স্থানাধিকার করার সাহায্য করিয়াছিল।

জাতিবিভাগ আজকাল একটা মহা অনর্থের মূল বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে ; কিন্তু কি উদ্দেশে উহা গঠিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আর্য্যবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এক ব্যবসায় অধিকার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত রাখিয়া দিলে, যাহারা অশক্ত তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান হয় না। পাছে নিতান্ত অকর্ম্মা দুর্ব্বল ব্যক্তিও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া উপায়হীন হইয়া পড়ে, এই জন্য আর্য্যগণ সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নিয়ম হইল যে, কেহই জাতিগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবে না। সমাজের অতি হেয় ব্যক্তির জন্যও এত সতর্কতা শুধু এই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেই সম্ভবপর। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদ শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে না। এই জন্য শ্রেণীবিশেষ সমাজকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যেমন সমাজের প্রতি কতকগুলি লোকের সহানুভূতি হারাইতেছি, তেমনি আমরা উপযুক্ততার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, ব্যক্তি-বিশেষকে উপযোগী বৃত্তি বা অধিকার দিতে বিরত হইতেছি। এইরূপ নিয়মের সংস্কার না হইলে আর্য্যদিগের সামাজিক

জীবন দিন দিনই দুর্ব্বিসহ ক্লেশদায়ক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইবে।*

আমার এই কথায় কাহারও মনে যেন ধারণা হয় না যে আমি বর্ণ-বৈষম্য উঠাইয়া দিতে বলিতেছি। যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া স্বভাবের অনুকূলে জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তি সুস্থির করিয়া দেওয়া যখন বর্ণবৈষম্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে চিরকালই লোকের বর্ণ-বৈষম্য স্থির রাখা কর্ত্তব্য। কারণ একই ব্যবসায়ে যদি সকল লোকই বুদ্ধিবৃত্তি বা শক্তি নিয়োগ করে, তাহা হইলে অন্যান্য বিভাগের কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে? বিশেষতঃ শক্তিসম্পন্ন কৃতী পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া শক্তিহীন লোক আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। কর্ম্ম না করিয়া যখন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না, তখন কৃতী ও অকৃতী, গুণবান ও নির্গুণ, পণ্ডিত ও মূর্খের প্রবেশের জন্য কর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ উন্মুক্ত না রাখিলে চলিবে কেন? সমাজ যখন বর্ত্তমান সময় গুণানুসারে কর্ম্ম যোগাইতে পারিতেছে না, এবং পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া অযোগ্যকে যোগ্য স্থান প্রদান করিতেছে, এবং যোগ্যকে অযোগ্য বৃত্তিতে নিয়োগ করিয়া সত্যপথভ্রষ্ট হইতেছে তখন যেরূপ

---

* স্বর্গীয় লেখক মহাশয়ের এ সকল ব্যক্তিগত মতামতের জন্য শাখা-পরিষৎ দায়ী নহেন।

—সম্পাদক।

সংস্কার দ্বারা সমাজের এই দোষ সংশোধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান সময়ের বর্ণবৈষম্য দ্বারা লোক-চরিত্রের মৌলিকতা নষ্ট হইতেছে।

স্বাধীন মত।

মানবচরিত্রের মৌলিকতা বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বাধীন মত ও স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন যে, শাখাপল্লব ছাঁটিয়া দিলে যেরূপ বৃক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ মনুষ্যমাত্রকে কঠোর শাসনের মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুসরণ করিতে বাধ্য করিলে মনুষ্যচরিত্রও সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়। আদর্শকে ধরিবার জন্য কতকগুলি নিয়মের বাঁধাবাঁধি কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যে সব মত পোষণ করিলে বা যে সব বৃত্তির অনুশীলন করিলে আদর্শ হইতে পিছাইয়া পড়িতে হয় না, সে সব মত পোষণ করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভগবানের সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, কোন প্রবৃত্তি বা বৃত্তির চরিতার্থতায় যদি ভগবৎ-সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহা হইলে উহা আচার বা নিয়ম বহির্ভূত হইলেও চরিতার্থ করিতে দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু এই কার্য্যে এইটুকুমাত্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহা পূর্ণ বা চরিতার্থ করিতে দিলে ব্যক্তিগত ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষিত হয় কি না? কোন ব্যক্তির সুখ বা মঙ্গলের পথে ঐরূপ কোন বৃত্তির অনুশীলন যদি কণ্টকবৎ পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সেই বৃত্তির অনুশীলনে

বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে অনেক স্থলে অনেকে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হয়েন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়াতে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। সমাজে স্বাধীন মত প্রকাশ করা ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করার গুরুত্ব তুল্য নহে। কোন একটী মত প্রকাশিত করার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, যাহাদের মধ্যে উহা প্রকাশিত হইল, তাহারা সেই মতটী কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ভাবে ব্যবহার করে। এইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীন মতও সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। মনুষ্য যখন নির্ভুল বা পূর্ণতাপন্ন নহে, তখন তাহাকে স্থান বিশেষে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দিলেও অপরের সঙ্গে তাহার মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। কতকগুলি সামবায়িক মত সংগ্রহ করিয়াই কোন বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে; লোকমাত্রই যাহাতে উহার প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় তদ্দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রতিবাদহীন মত সমাজে প্রবর্ত্তন করিলে অনেক সময় সমাজ অনেক কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয়।

প্রকৃতির আধিপত্য প্রত্যেক সমাজের উপরই পরিদৃষ্ট হয়। অনেকে উহা না বুঝিয়া প্রকৃতিবিরোধীয় ভাব অপর সমাজ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ সমাজে প্রবর্ত্তন করেন। এরূপ অনুকরণ পরিত্যাজ্য।

প্রত্যেক সমাজই কিছু না কিছু অনুকরণপ্রিয়। গুণের অনুকরণ অনেক সময় প্রশংসনীয়, কিন্তু যাহার হৃদয়ে পরিণতির একটা আদর্শ আছে তাঁহারা সর্ব্বথা কখনও অনুকরণ করিবার পক্ষপাতী হন না। সংসর্গফলে যে উদার ভাব ও নীতি শিক্ষা করা যায়, উহা চরিত্রে প্রতিফলিত করাকে অনুকরণ বলে না। পৃথিবীর নিকট বা লোকবিশেষের নিকট যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, উহা চরিত্রে ফলাইলেই যদি অনুকরণ করা হইত তাহা হইলে অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধদের নিকট আমাদের কি শিখিবার কিছুই নাই? স্বাধীনভাবে কার্য্য করার অধিকার দেওয়ারও একটা নির্দ্ধারিত সময় থাকা উচিত। প্রত্যেক সমাজস্থ লোকের অন্ততঃ যৌবনকালটা অভিজ্ঞ লোকের শিক্ষার অধীনে ব্যয় হওয়া কর্ত্তব্য। লোকের যখন মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, নৈতিক বলে চরিত্র উন্নত ও নির্দ্দোষ হয়, মুখখানিতে সংযমের কঠোরতা সূচিত হয়, তখন তাহাকে কার্য্যবিশেষে যদৃচ্ছাক্রমে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনুপযুক্ত সময়ে স্বাধীনভাবে চলিতে দিলে লোকের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্থূল কথা, জীবনের কতকাংশ বিচার উপলব্ধি এবং প্রভেদাত্মক জ্ঞানার্জ্জনে ব্যয় করিয়া প্রত্যেক লোকের স্বেচ্ছানুরূপ পন্থাবলম্বনের যোগ্য হওয়া উচিত। যাহাদের জীবন কেবল প্রচলিত রীতি ও পুরাতন প্রথার অধীনে ব্যয় হয়, তাহারা যেমন বুদ্ধি দ্বারা ভালমন্দের প্রভেদ

অনুকরণ।

করিতে পারে না, তেমন উৎকৃষ্ট পথে অগ্রসর হইবার জন্য অভিলাষও করে না। ব্যায়ামের ফলে যেমন মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়, তেমন মানসিক শক্তিও উপযুক্ত ব্যবহারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানসিক বৃত্তির যত স্ফুরণ হইবে ততই সত্যের ভিতর হইতে অধিকতর সত্য বাছিয়া বাহির করা যাইবে। কিরূপে মানসিক শক্তির পরিচালন করা যায়, তাহা জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যখন সমাজে একটি সত্য প্রচারিত হয়, তখন উহা নিজের যুক্তিতর্কের সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া উচিত। যুক্তি তর্ক না খাটাইয়া অপরের প্রচারিত সত্য বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিলে অনেক সময় যুক্তিশক্তি নষ্ট হয়। যে কোন জটিল বিষয়ই হউক না কেন, যুক্তিতর্কবলে একবার বুঝিয়া লইতে পারিলে, তৎপ্রতি লোকের একটা আসক্তি জন্মে। যে কার্য্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ থাকে না, সে কার্য্য মহৎ হইলেও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। বিষয়বিশেষে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন এই জন্যই কতকটা বাঞ্ছনীয়। সমাজের যাহারা প্রধান লোক, সময়ের গতির দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকার সমাজ দেখিতে পাই। এক প্রকার হ্রাসবৃদ্ধিরহিত বদ্ধ সমাজ, অপর প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ উদ্যমশীল লোকের উন্নতিশীল সমাজ।

যে সমাজ পুরাতন প্রথার একটুও পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না, যে সময়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানিয়া

চলে, সময় তাহার প্রতিকূল হওয়াতে, উহা উন্নতির পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ যে সমাজস্থ লোক কোন এক সময় স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের জীবনধারণের উপায় যদি পরহস্তগত হয় তাহা হইলে সময়ানুসারে পূর্ব্বতন বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া উহারা যদি প্রাচীন প্রথা ও রীতিই সমাজরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেন, তাহা হইলে তাহাদের সমাজ যে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভাগ্যক্রমে যদি ঐ শ্রেণীর লোকের সমাজ টিঁকিয়া যায় তাহা হইলে তাহাই যথেষ্ট। বিজয়ীর সংশ্রবে বিজিতের কেবল ব্যবসায় বাণিজ্য এবং প্রাচীন রীতি নীতিরই পরিবর্ত্তন ঘটে না, আদর্শেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যে সময় কোন জাতির আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটে, সে সময় সে জাতি মৃতাবস্থায় গিয়া দাঁড়ায়। আর্য্যসন্তানেরা যখন মধ্য এশিয়া পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ পথ ধরিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন প্রকৃতি সুন্দরী তাহাদের উপাস্য হইয়াছিলেন। কেনই বা না হইবেন! সেই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, অভ্রভেদী শৈলমালা, অনায়াসলভ্য ফলমূলশোভী অরণ্যানী, যাহার কথাই বল, সকলগুলিই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের হেতু হইল। প্রকৃতিপ্রদত্ত ঐ সব আশ্চর্য্যজনক জিনিষ অবলোকন করিয়া আর্য্যসন্তানেরা প্রকৃতিকে

বিশুদ্ধ উন্নতিশীল সমাজ।

উপাসনা করিতে শিখিলেন। আজও প্রকৃতির বিচিত্র হস্তনির্ম্মিত সেই সব শোভমান দৃশ্য বর্ত্তমান, কিন্তু বিজয়ীর সংশ্রবে বিজিতের আদর্শেরও এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, উহারা আর শিক্ষিত লোকের নিকট পূজার্হ নহে! হিন্দুরা প্রকৃতির প্রসাদে যে রমণীয় স্থানে বাস করিতেছে, তাহাতে মনকে মহানের দিকে প্রসারিত করার পক্ষে ঐ নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলি কি অমূল্য সম্পদ্ নহে? বিজয়ীর গুণগ্রহণ করা পরাধীন জাতির মঙ্গলজনক, কিন্তু পরাধীন জাতির যাহা স্বাভাবিক আদর্শ, তাহা পরিত্যাগ করার কল্পনা কি পরিতাপের বিষয় নহে! যে সমাজ সময় ও প্রকৃতির অনুকূলে চলে সেই সমাজই উন্নত হয়। হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান সময় প্রকৃতির ও সময়ের প্রতিকূলেই চলিতেছে। এই জন্য বলিতে হয় যে, তাহা ধ্বংসোম্মুখ; নতুবা স্থিরভাবাপন্ন বা Stationary.

পাশ্চাত্য সমাজ দোষবর্জ্জিত না হইলেও যে অনেক বিষয়ে উন্নত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেখা উচিত, কোন্ গুণে উহা এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজের অধিকাংশ লোকই যে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করিয়া শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না। তাঁহাদের উন্নতির মূল অনুশীলন ও চরিত্রের বিবিধত্ব বা বৈচিত্র্য। (Diversity of character) ইউরোপীয় লোকের প্রধান গুণ এই যে, উহাঁরা স্থির লক্ষ্য, এবং উহা উহাঁদের স্বভাবানুযায়ী

করা চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। বোধ হয়, এই জন্যই অল্পায়াসে প্রায় কার্য্যে অপ্রত্যাশিত ফল লাভ করিয়া উহাঁরা সমাজ ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া থাকেন। এ দেশের লোকের যেরূপ অবস্থা ও সামাজিক রীতি নীতি, তাহাতে কয়জন প্রকৃতির অনুকূলে কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হয়েন? সমাজ সুসংস্কৃত নহে বলিয়াই যিনি যে বিভাগে নিযুক্ত হইয়া স্বাভাবিক শক্তিবলে বিশেষত্ব দেখাইতে পারিতেন, সে বিভাগ তাঁহার জন্য উন্মুক্ত নহে! সমাজের এই দোষ অমার্জ্জনীয়। ইহার ফলে সমাজ অনেক প্রতিভাবান্ যোগ্য পুরুষের উপযুক্ত সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইতেছে। প্রতিভা ও শক্তির অনুকূলে কর্ম্ম যোগাইয়া হিন্দুসমাজ যদি হিন্দুদের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে সমাজ অনেক উন্নতাবস্থায় আরোহণ করিয়া বিদেশীয় লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিত। পাশ্চাত্য সমাজের এই গুণ যে, তাহারা সমাজস্থ লোকের প্রতিভা পরিস্ফুট করার জন্য কর্ম্মের নানারূপ বিভাগ খুলিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বিরাট হিন্দুসমাজ তদ্দিকে দৃক্‌পাতশূন্য। একটি বর্দ্ধমান বৃক্ষের মূলদেশে সার দেওয়ার পরিবর্ত্তে যদি ধ্বংসকারী ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বৃক্ষটি স্বভাবের নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত না হইয়া যেমন দিন দিন অন্তঃসারশূন্য হয়, আমাদের সমাজস্থ লোকও প্রকৃতির অনুকূলে কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত না দেখিয়া শুষ্ক তরুর ন্যায় অন্তঃসার

শূন্য হইতেছে। ক্রমাগতই যদি হিন্দুসমাজের লোক এইরূপ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া প্রতিভা ও শক্তি জলাঞ্জলি দিতে বসে তাহা হইলে সমাজ কত জন উপযুক্ত লোকের শিক্ষা দেওয়ার স্পর্দ্ধা করিতে পারিবেন? বহু অত্যাচার হিন্দু সমাজ সহ্য করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহার শরণাগত লোকের প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্মদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সমাজ বুঝি মরমে মরিয়া যাইতেছে। যে সমাজের অধীনে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিবার উপাদান পায় না, সে সমাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। চারিদিকে ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা শুনিয়া আশান্বিত হইতেছি যে, বিধাতা বুঝি এখন একবার অভাগা ভারত-সন্তানের প্রতি প্রসন্নমুখে চাহিবেন। ধনী সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেন ধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় এই অবসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখেন।

সমাজ যখন মনুষ্যের অসাধারণ হিতৈষী, তখন মনুষ্যের উপর কি তাহার কোন প্রভুত্ব নাই? মনুষ্যমাত্র সমাজের অধীন হইলেও সমাজ তাহার কতকটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। এই উপকারের জন্য ব্যক্তি মাত্রেরই তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যেখানে ব্যক্তি বা জনসাধারণের কোন ন্যায্য স্বার্থ বা অধিকার কাহারও কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হয়, সেইখানেই সমাজ শান্তিহারকের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের অধিকারী। এই অধিকারের সীমা দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে, এক

সমাজের প্রভুত্ব।

প্রকার আইনসঙ্গত অধিকার অপর প্রকার সমাজনির্দ্ধারিত অধিকার। ব্যক্তিবর্গকে এই দুই অধিকার প্রদানের জন্য সমাজ যখন কাতর তখনই বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় এবং সমাজের শক্তি-হীনতা প্রকাশ পায়। ব্যক্তিবর্গকে এই দ্বিবিধ অধিকার প্রদানের জন্য সমাজ কেবল দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালন করিয়াই কি নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের উচ্চ-শিক্ষা প্রদানের বন্দোবস্ত দরকার। আমার মনে হয় প্রকৃত শিক্ষা পাইলে—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অগ্রসর হইলে মনুষ্যমাত্রই শান্তভাবাপন্ন হইবে, এবং বিভিন্ন সমাজস্থ লোক একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরের উপকারের চেষ্টায় রত থাকিবে। তখন হয়ত সমাজে আসুরিক-শক্তি সম্পন্ন লোকের মোটেই দরকার হইবে না। কিন্তু সেরূপ সময় উপস্থিত হইবার বিশেষ বিলম্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। যতকাল পর্য্যন্ত আমরা না বুঝিব যে, পরের উপর কর্ত্তব্য পালন করিয়াই আমরা সমাজকে সবল রাখিতে পারি না, নিজেরাও যদি কর্ত্তব্যের রেখা বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করি তাহা হইলেও সমাজদেহ রুগ্ন হইয়া পড়ে, ততকাল পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আমরা আত্মদ্রোহী। সমাজতত্ত্ববিদ্ মনস্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁহার একখানি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন তাহা শুনিলেই ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"No person is an entirely isolated being. It is impossible for a person to do anything seriously or permanently hurtful to himself without mischief reaching at least to his near connexions, and often far beyond them. If he injures his property he does harm to those who directly or indirectly derived support from it, and usually diminishes by a greater or less amount, the general resources of the community. If he deteriorates his bodily or mental faculties he not only brings evil upon all who depend on him for any portion of their happiness but disqualifies himself from rendering the services, which he owes to his fellow-creatures generally."

সমাজ-তত্ত্বের এরূপ সার আলোচনা অল্প গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। মনে হয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই চূড়ান্ত কথা, ইহার উপর আমার কোন বক্তব্য নাই।

স্থরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

বিশ্ব-নৃত্য

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত নৃত্য কিয়ৎ পরিমাণে ভাবুক মাত্রেরই গোচরীভূত। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রকৃতির ভক্ত মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে ইহার স্বাদ উপলব্ধি করিয়াছেন ; এবং কবিগণ নানাভাবে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক নদী ও সমুদ্রের তরঙ্গ-নৃত্য ও তদুপরি পোতাদির নৃত্য, বায়ু-সঞ্চালন-জনিত বৃক্ষলতাদির নৃত্য, ভূকম্পনে পৃথিবীর নৃত্য, জোয়ারভাটার নৃত্য, গ্রহ নক্ষত্রের ঘূর্ণন-নৃত্য, বাদন কালে বাদ্যযন্ত্রের নৃত্য,—ইত্যাদি জড়-নৃত্য কে না দেখিয়াছে? জীব-নৃত্যের ত কথাই নাই। তবে এ সকল নৃত্যের রসাস্বাদ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, সে স্বতন্ত্র কথা।

সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অপেক্ষা কবির দৃষ্টি অনেক সূক্ষ্ম ও দূরগামী। তাই সাধারণে যাহা দেখিতে পায় না, অথবা অস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়, তাহা তাহাদিগের প্রত্যক্ষীভূত করিবার জন্য কবিগণ কাব্য রচনা করেন। কোনও রসগ্রাহী ব্যক্তি কখনও বলিবেন না যে, কবির কল্পনা কল্পনা মাত্র। কবি স্বহৃদয়ে যে সত্যের উপলব্ধি করেন, কল্পনার সাহায্যে তাহাই ফুটাইয়া তুলেন। বিশ্ব-নৃত্য

সম্বন্ধে যে সকল কবিতা এ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে, তাহার সারাংশ উপযুক্ত মালাকার কর্ত্তৃক গ্রথিত হইলে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই।

কবি দেখেন সত্যের এক দিক, বৈজ্ঞানিক দেখেন আর এক দিক। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিও অতি তীক্ষ্ণ ও দূরগামী। বৈজ্ঞানিক যে অদ্ভুত বিশ্বনৃত্য দর্শন করেন তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! এই প্রবন্ধে তাহার একটু আভাষ দিব, মনে করিয়াছি। নৃত্যময়ী বাগ্বাদিনী আমার সহায় হউন।

বিজ্ঞান সম্পূর্ণ স্থির পদার্থের কথা জানে না। পদার্থ মাত্রই কোন না কোন প্রকারে গতিশীল। উপগ্রহগণ গ্রহের এবং গ্রহগণ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে; সূর্যদেব নিজেও গ্রহ-পরিবার লইয়া অবিরাম গতিতে চলিয়াছেন। যাহাদিগকে স্থির নক্ষত্র বলা হয়, তাহাদের গতিরও যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বাস্তবিক, যদি নক্ষত্রমণ্ডলী নিউটনের মহাকর্ষণ নিয়মের বশবর্ত্তী হয়, তবে কাহারও স্থির থাকা এক প্রকার অসম্ভব।

কিন্তু গতিমাত্রই নৃত্য নহে। আমরা এখন দেখিব, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী গতির মধ্যে নৃত্যের বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান আছে কি না।

নৃত্যের প্রধান লক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তন। এই প্রত্যাবর্ত্তন বহুবিধ। যথাঃ—(১) নর্ত্তক যে স্থান হইতে নৃত্য আরম্ভ করে পুনঃ পুনঃ

সেই স্থানে ফিরিয়া আসে। (২) নর্ত্তকের অঙ্গ-সংস্থান নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনঃপুনঃ পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়। (৩) সর্ব্বাঙ্গীন অঙ্গ-সংস্থানের প্রত্যাবর্ত্তন হইতে পৃথক বিভিন্ন অঙ্গের ও প্রত্যঙ্গের সংস্থানের বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। (৪) একই অবস্থার প্রত্যাবর্ত্তন অসংখ্য প্রকারের গতি দ্বারা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু নৃত্যে একই প্রকারের গতিও পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। (৫) গতি বেগের নানারূপ পরিবর্ত্তন হয় এবং এই বেগঘটিত বিভিন্ন অবস্থা পুনঃ পুনঃ প্রত্যা-বর্ত্তন করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে গতিতে অল্পাধিক পরিমাণে নিয়মিত প্রত্যাবর্ত্তন দৃষ্ট হয় তাহাই নৃত্য। এইরূপে নর্ত্তক কখনও পদ, কখনও হস্ত, কখনও নিতম্ব, কখনও বক্ষঃদেশ বা মস্তক, আর কখনও বা সর্ব্বাঙ্গ নানাভাবে সঞ্চালন করে; চক্ষু, ওষ্ঠ, করাঙ্গুলি প্রভৃতি উপাঙ্গগুলিও নিশ্চেষ্ট থাকে না, তাহারা পৃথক্‌ভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকে; তাহার দেহ কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে কখনও সম্মুখে, কখনও পশ্চাতে অবনত হইতে থাকে; সে কখনও সম্মুখ দিকে, কখনও পশ্চাদ্দিকে চলিতে থাকে; আবার কখনও ঘুরিতে থাকে; কখনও বা গান করিতে থাকে। বিশ্বনৃত্য ব্যাপারেও কি আমরা এইরূপ ঘটনাবলীই প্রত্যক্ষ করি না?

সম সরল গতি নিউটনের গতি-নিয়মের প্রথম সূত্রেই আবদ্ধ; প্রকৃতিতে তাহার অস্তিত্ব কোথাও নাই। জগতে আমরা যত

গতি প্রত্যক্ষ করি, সে সমস্তই প্রত্যাবর্ত্তনশীল গতি এবং, সেগুলির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ প্রত্যাবর্ত্তনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

নিয়মিত প্রত্যাবর্ত্তনের ফল তাল, তাই নৃত্য তালযুক্ত হইয়া থাকে। বিশ্বনৃত্যও বেতালা নহে। তাহার তাল এমন বিশুদ্ধ যে, নৃত্যশীল পদার্থ কোন্ সময়ে কি ভাবে কোথায় থাকিবে তাহা অনেক স্থলে অতি সূক্ষ্মরূপে গণনা করা যাইতে পারে। যেখানে তাহা পারা যায় না সেখানেও কালে গণনার উপায় আবিষ্কৃত হইবে, বৈজ্ঞানিকগণ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে এইরূপ আশা করেন। এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধানই অনেকের জীবনের ব্রত; সে জন্য তাঁহারা অন্য সমস্ত সুখ, স্বার্থ, স্বাস্থ্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তত। বিশ্বনৃত্যে তাল আছে বলিয়াই প্রাচীন দার্শনিক পিথাগোরস জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গীত শুনিয়াছিছেন। সে মহাসঙ্গীত শুনিবার অধিকার ও সৌভাগ্য, তাঁহারই মত বিশ্বগ্রাহী প্রাণমন না হইলে কেমনে লাভ করা যাইবে ?

যত প্রকার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলা হইল, তাহার সকল গুলি না থাকিলে যে নৃত্য হয় না, এমন নহে। কেহ এক বাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে বাস করিতে গেলে যদি বালকগণ নাচিতে নাচিতে নূতন বাড়ীতে গমন করে, আর পুরাতন বাটিতে ফিরিয়া না আসে তথাপি সে নৃত্যকে নৃত্যই বলে। বিশ্বনৃত্যেও সেইরূপ। কোথাও

কোন কোন প্রকারের প্রত্যাবর্ত্তন আর কোথাও বা অন্যবিধ প্রত্যাবর্ত্তন দেখা যায়। আর তালও নানাবিধ ; কোথাও দ্রুত কোথাও ধীর, কোথাও একবার দ্রুত আবার ধীর, আবার দ্রুত, আবার ধীর, ইত্যাদি। এ সকল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা অসম্ভব। আমি কেবল আভাষ দিতে চেষ্টা করিব।

এই সৌরজগৎটাকে দেখা যাউক। গ্রহ-উপগ্রহ লইয়া সূর্য্য-দেব কি খেলাই খেলিতেছেন! আপনি ঘুরিতেছেন, আর ইহা-দিগকেও ঘুরাইতেছেন। অদৃশ্য দুর্ব্বোধ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ইহারা কখনও সূর্য্য হইতে কিছু দূরে সরিয়া যাইতেছে, কখনও বা কিছু নিকটে আসিতেছে। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বেগও কমি-তেছে, বাড়িতেছে। এই সকল গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যাই বা কত! ৮টী সুবৃহৎ গ্রহ ছাড়া বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রতর গ্রহ আছে ; উল্কাপিণ্ড ত অসংখ্য। ধূমকেতুর খেলা কি অদ্ভুত! যেন জ্বলন্ত গোলক লইয়া লোফালুফি! এইরূপে খেলিতে খেলিতে সূর্য্যদেব অবিরাম গতিতে কোনও সুদূরবর্ত্তী কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। এই মহানৃত্যের কথা ভাবিতে গেলে কাহার হৃদয় না বিস্ময়ে পূর্ণ হয়?

এখন এ নৃত্যের আরও একটু ভিতরে প্রবেশ করা যাউক। দিনমণি নিজের ভিতরই বা কি আশ্চর্য্য খেলা খেলিতেছেন! আমরা তাহার সামান্য আভাষ মাত্র পাইয়াছি। এই মহান্ বহ্নি-পিণ্ডে অতি অদ্ভুত অগ্নি-ক্রীড়া অনবরত চলিয়াছে। বহু যোজন

বিস্তীর্ণ অগ্নিশিখা বহু সহস্র যোজন উর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, নানাভাবে কাঁপিতেছে, ঘুরিতেছে; আবার তাহারা লুকাইলে কৃষ্ণ গহ্বরগুলি বদন ব্যাদান করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। এ খেলাই কি কম অদ্ভুত?

পৃথিবীর কথা আমরা অনেক বেশী জানিতে পারিয়াছি। পৃথিবীকে বিমানচারী গোলক সমূহের নমুনা স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। পৃথিবী যে ভাবে চলিয়াছে, অন্যান্য গ্রহাদিও একই মহাকর্ষণের নিয়মে চালিত হইয়া সেইরূপ ভাবেই পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই বলিতে পারা যায়। পার্থক্য অবশ্যই আছে; কিন্তু তাহা সাধারণতঃ পরিমাণগত, প্রকারগত নহে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখন পৃথিবীর নৃত্যের কথা আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবী-দেবী স্বদেহ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নৃত্য এমন সাদাসিধা নহে। সুচতুরা নৃত্যজ্ঞার ন্যায় দেহ একদিকে অবনত করিয়া তিনি চলিয়াছেন, আবার এই অবনতির দিক্ অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত করিয়া শরীর ঘুরাইতেছেন। পৃথিবীর এই দেহাবনতির ফলে বিষুব-বৃত্ত ও পৃথিবী-কক্ষার মধ্যে ২৩ অংশ ২৮ কলা পরিমিত কোণ দৃষ্ট হয়, আর উক্ত অবনতির পরিবর্ত্তনের এক ফল অয়ন চলন; প্রথমের ফল ঋতুভেদ, দ্বিতীয়ের ফল ঋতুসমূহের পশ্চাদ্গতি।

কেবল তাহাই নহে।—সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণবেগের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, দৈনিক আবর্ত্তন-বেগেরও সেইরূপ নিয়মমত হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে; ক্রনমেটর ঘড়ির সহিত সূর্য্যঘড়ির তুলনা করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আবার নর্ত্তকের শরীর-কম্পনের ন্যায় পৃথিবীদেহও অনবরত কম্পিত হইতেছে, যন্ত্রসাহায্যে তাহা জানা গিয়াছে। অবশেষে নর্ত্তকের করাঙ্গুলি প্রভৃতি যেমন বিশেষ ভাবে কম্পিত হয়, ভূমিকম্পাদিতে পৃথিবীর প্রদেশবিশেষও সেইরূপ কম্পিত হয়। সে কম্পনেরই বা রকম কত! কখনও কোন স্থান উৰ্দ্ধাধোভাবে, কখনও কোন স্থান অগ্রপশ্চাদ্‌ভাবে, কখনও বা কোন স্থান পাশাপাশি ভাবে কাঁপিতে থাকে; আবার এই ত্রিবিধ কম্পনের মিলনজাত বহুবিধ বিচিত্র কম্পন বিভিন্ন সময়ে লক্ষিত হইয়া থাকে।

একবার মনে মনে কল্পনা করুন দেখি, যেন আপনি আকাশের কোন স্থানে দাঁড়াইয়া ব্যোমচারী গোলক-বৃন্দের এই মহানৃত্য দেখিতেছেন। সম্যক্ দর্শন সম্ভব হইবে না; কিন্তু যে টুকু আপনার কল্পনানেত্রের গোচরীভূত হইবে, সেইটুকু দেখিয়া আপনি স্তম্ভিত হইবেন। প্রত্যেক সৌরজগতের মধ্যস্থলে সূর্য্য নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে; আর তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রহ-পরিবার নৃত্য করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিতেছে। এইরূপ শত, সহস্র, কোটি কোটি সৌরজগৎ মহানৃত্য-মহোৎসবে মাতোয়ারা হইয়া পরি-

ভ্রমণ করিতেছে। কবে এই নৃত্যের আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কেহ জানে না; কবে এই নৃত্যের শেষ হইবে, তাহাও কেহ জানে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টি যতদূর চলে, তাহাতে ইহার আদি-অন্তের যে আভাষ (আভাষ বলিলাম, কারণ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের অনুমান কোনক্রমেই নিশ্চিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না)—পাওয়া যায় তাহাতে ইহাই বোধ হয় যে, সে আদি ও অন্ত একবিধ নৃত্যের অন্যবিধ নৃত্যে পরিণতি মাত্র। সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৈজ্ঞানিক কল্পনা এই সকল গোলকের পরিবর্ত্তে দিগন্ত-ব্যাপী নীহারিকা-পুঞ্জ (nebulæ) দেখিতে পায়। এখনও আকা-শের কোন কোন স্থানে এইরূপ নীহারিকারাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই নীহারিকা-পুঞ্জ স্থির নহে; নানা স্থানে নানা ভাবে আবর্ত্তন রূপ নৃত্যের ফলে নীহারিকারাশি কোথাও ঘনীভূত, কোথাও বিরলীভূত হইতেছে; এবং ক্রমে ঘনীভূত নীহারিকারাশি এক একটী জ্যোতিষ্ক-গোলকের আকারে পরিণত হইতেছে। প্রথমে এই গোলকগুলি বাষ্পময় থাকে, পরে ক্রমে তরল ও কঠিন অবস্থায় উপনীত হয়। বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন অবস্থা যে আণব নৃত্যের ফল, তাহার কথা পরে বলিব। সূর্য্যে—অন্ততঃ বহির্দ্দেশে —বাষ্পীয় অবস্থা, পৃথিবীতে কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়, এই তিন অবস্থারই একত্র সমাবেশ। চন্দ্রে বোধ হয় কেবলই কঠিন অবস্থা; আর নীহারিকা বোধ হয় অতি সূক্ষ্ম বাষ্পীয় অবস্থায় আছে।

• নীহারিকা পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা কে জানে? তবে জগতের অন্ত সম্বন্ধে বিজ্ঞান যে অনুমান করে, তাহা হইতে আদি বিষয়েও কিছু আভাষ পাওয়া যায়। সে চিত্র এইরূপ;—বাধা হেতু সমস্ত শক্তি তাপে পরিণত হইবে, সেই তাপ বিকীর্ণ হইয়া দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইবে; সমস্ত ব্যোমচারী পিণ্ডগুলি মিলিত হইয়া এক মহাপিণ্ড জন্মিবে, তাহাও ক্রমে গতিহীন, তাপহীন হইয়া পড়িবে। —কিন্তু থামো; এব্রহ্মাণ্ড কি একেবারেই অসীম? যে ঈথরের মধ্য দিয়া তাপ বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার কি শেষ নাই? যদি থাকে, তবে আবার বিকীর্ণ তাপরাশি দিগন্ত হইতে ফিরিয়া আসিবে, নির্ব্বাণ মহাপিণ্ডগুলিকে জ্বালাইয়া তুলিবে, হয়ত আবার নীহারিকায় পরিণত করিবে, জগল্লীলা-মহানৃত্য আবার আরম্ভ হইবে। হয়ত বিস্তীর্ণ আকাশের এক স্থানে পুরাতন নির্ব্বাণোন্মুখ জগৎ মন্থর গতিতে চলিয়াছে। অন্যত্র নূতন জগৎ নূতন তেজে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

অবশ্য এসকল কথা আনুমানিক মাত্র। সেই সুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের কথা কাহারও নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে বৈদিক ঋষির সহিত সকলেরই বলিতে হয়, "কে সত্য জানে? এসকল কোথা হইতে আসিল, তাহা কে বলিবে? * * * পরমাকাশে ইহার যে অধ্যক্ষ আছেন, জানিলেও তিনি, না জানিলেও তিনি।" এখন অনুমানের

রাজ্য হইতে আবার প্রকৃতের রাজ্যে, প্রত্যক্ষের রাজ্যে আসা যাউক।

পৃথিবীতে আমরা যে সকল গতি দেখিতে পাই, সেগুলির প্রকৃতি আলোচনা করুন। ভূমি মাত্রই বন্ধুর, সুতরাং ভূমির উপর দিয়া কোনও বস্তু গড়াইয়া দিলে তাহা কিছু না কিছু উর্দ্ধাধঃ কম্পিত না হইয়া যায় না। লৌহবর্ত্মগুলি যথাসাধ্য মসৃণ করা হয়; কিন্তু তাহার উপর দিয়া গমন কালেও শকটের কম্পন সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। বায়ুর মধ্য দিয়া কোনও বস্তু নিক্ষেপ করিলেও তাহার গতি কম্পনযুক্ত হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু ঘূর্ণনও প্রায়ই থাকে। উর্দ্ধ হইতে কোনও বস্তুর পতনের সময়ও সেই কথা; নাচিতে নাচিতে উহা পড়িতে থাকে। মাটীতে পড়িয়াও উহার নৃত্যের বিরাম হয় না; কখনও বা স্পষ্টই লাফাইতে থাকে, কখনও বা উহার মধ্যে কিছুকাল সাধারণ চক্ষুর অদৃশ্য সূক্ষ্ম কম্পন-নৃত্য চলিতে থাকে।

জল-স্রোতের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন। জল কখনও সমানভাবে চলিয়া যায় না। উপরের জল নীচে যাইতেছে, নীচের জল উপরে উঠিতেছে, কোথাও বা ঘূর্ণাবর্ত্তের জল পাক খাইতেছে; দেখিবেন, এইরূপ নানারঙ্গে নাচিভে নাচিতে জল চলিয়াছে। তরঙ্গের নৃত্য ত এত স্পষ্ট যে, তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাহার মধ্যেও নানা রকম আছে; উর্দ্ধাধঃ কম্পন, অগ্রপশ্চাৎ কম্পন ও পার্শ্বাপার্শ্বি

কম্পনের মিশ্রণে কত বিচিত্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা তরঙ্গোপরি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডাদির গতি দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। জোয়ার-ভাটার অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী তরঙ্গ চন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে কেমন উদ্বেল হৃদয়ে চলিয়াছে।

বায়ুর মধ্য দিয়া জল-ধারার পতন কালীন নৃত্যও অতি চমৎকার। ধারাটীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবেন, উহা কোথাও স্থূল, কোথাও সরু; যেন ধারাটী একবার স্ফীত আবার সঙ্কুচিত হইতেছে। ধারাটী যত নীচে নামিতে থাকে ততই উহার বেগ বর্দ্ধিত হওয়ায় উহা ক্রমেই সরু হইয়া আসে এবং দুই স্ফীত অংশের মধ্যবর্ত্তী সরু হইয়া পড়ে; অবশেষে স্ফীত অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া ফোঁটায় পরিণত হয়। ইহা কি জলের পতনকালে নর্ত্তনশীলতার পরিচায়ক নহে? আবার ফোঁটাগুলি যখন পড়িতে থাকে, তখন সে গুলিতে কঠিন পদার্থের পতন কালীন কম্পনের সদৃশ কম্পন ত থাকেই, তা ছাড়া সে গুলি আবার একবার লম্বা আবার চেপ্টা, আবার লম্বা আবার চেপ্টা আকার গ্রহণ করিতে করিতে চমৎকার নৃত্য দেখাইতে দেখাইতে ভূতলে পতিত হয়।

জলের কথা যেরূপ বলা হইল, সকল তরল পদার্থের স্রোত ও ধারাতেই সেইরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। কোনও তরল পদার্থই কখনও ঠিক সমান ভাবে চলে না।

জলের ন্যায় বায়ু-সমুদ্রেও প্রত্যহ জোয়ার-ভাটা চলিয়াছে,

তাহাতেও ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে বায়ু-বিন্দুগুলি নাচিয়া তোলপাড় হইতেছে। অন্ধকার গৃহে আলোক-রেখার সাহায্যে বায়ুর মধ্যে ধূলিকণার নৃত্য সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ আলোকে সেগুলি দেখা যায় না, কিন্তু নৃত্য সর্ব্বদাই সেইরূপ চলিতে থাকে। মেঘ ও কুয়াসার মধ্যে জল-কণার নৃত্যও ঠিক সেইরূপ। এই যে ধূলি ও জল-কণার নৃত্য, বায়ুর নৃত্যই তাহার কারণ। এখন বায়ুর নৃত্য একবার মনে ধারণা করিতে চেষ্টা করুন। নিতান্ত বদ্ধ বায়ুতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি সর্ব্বদা চঞ্চল নৃত্যে ব্যাপৃত। বায়ুস্রোতে আবার অন্যবিধ নৃত্য চলিতে থাকে; বাণিজ্য-বায়ু প্রভৃতি অনেক স্রোত নাচিতে নাচিতে আকাশের ঊর্দ্ধদেশ ঘুরিয়া আবার পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসে; এতদ্ভিন্ন নানা স্থান হইতে সবাষ্প উষ্ণ বায়ু ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তথায় বাষ্প মেঘে ও বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া, নাচিতে নাচিতে পৃথিবীতে অবতরণ করে, বায়ুও আবার কিছুকাল পরে নামিয়া আইসে; আবার কোথাও নানাদিক হইতে আগত বায়ু-স্রোত মিলিত হইয়া, যেন পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ঘূর্ণন-নৃত্যে প্রবৃত্ত হয়। নৃত্যের কোথাও বিরাম নাই।

বায়ু-কণার নৃত্যের কথা যাহা বলা হইল জল-কণারও সেইরূপ নৃত্য আছে, তবে তাহা অতি অল্পদূর-ব্যাপী। কিন্তু জলের বিভিন্ন স্থানে উত্তাপের বৈলক্ষণ্য হইলে, তাহাতে একটা গোলমাল উপস্থিত

হয়। জল আলে চড়াইলে তাহাতে যে নৃত্য আরম্ভ হয়, হরিদ্রার গুঁড়া কি তদ্রূপ কিছু তাহাতে দিলে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। পরে যখন জল ফুটিতে থাকে, তখন সে নৃত্য আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হয় না। জল ও বাষ্প মিলিয়া সে এক চমৎকার নৃত্য! বাষ্প-বুদ্বুদগুলি কেমন সুন্দর একটীর পর আর একটী, তার পর আর একটি করিয়া উঠিতে থাকে। তরল পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়াতেও এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তপ্ত ভূমির উপর আলোক-নৃত্য সকলেই দেখিয়াছেন, যেন দৃশ্যমান আলোকরাশি এক অদ্ভুত ভৌতিক নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অপর পার্শ্বস্থ পদার্থগুলিও যেন সেই নৃত্যে যোগ দিয়াছে, এইরূপ মনে হয়। এই আলোক-নৃত্য উত্তপ্ত বায়ুর নৃত্যেরই ফল। নিম্নস্থ উত্তপ্ত বায়ু বিরলীভূত হইয়া উপরে উঠে, উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন বায়ু নীচে নামে, আবার তাহা উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে, উপরের বায়ু নীচে নামে, এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে; তাহাতে ভূ-পৃষ্ঠের সমীপবর্ত্তী বায়ুর ঘনত্বের পুনঃ পুনঃ হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াতে, তাহার মধ্য দিয়া যে আলোক-রশ্মি আসে তাহার পুনঃ পুনঃ দিক পরিবর্ত্তন হয়; ইহাই এই আলোক-নৃত্যের কারণ।

বায়ুর নৃত্যের কথা যাহা বলা হইল, সকল বায়বীয় পদার্থের মধ্যেই যথাসম্ভব সেইরূপ নৃত্য সংঘটিত হয়।

দোলক একবার দোলাইয়া দিলে, অনেকক্ষণ দুলিতে থাকে।

একখণ্ড বেত্রের একদিক হস্তে রাখিয়া আর একদিক টানিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা অনেকক্ষণ কাঁপিতে থাকে। তানপূরার তারে একবার অঙ্গুলির টান পড়িলে তাহার ঝঙ্কার অনেকক্ষণ চলিতে থাকে। জলের মধ্যে একবার লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহার আন্দোলন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থামে না। বায়ুর আন্দোলন সম্বন্ধেও সেই কথা; একবার আন্দোলন উৎপন্ন হইলে তাহার বিরাম হইতে অনেকক্ষণ লাগে। পদার্থমাত্রই অল্পাধিক স্থিতিস্থাপক; সুতরাং তাহাকে টানিয়া বা চাপিয়া ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে যে অংশ প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা সঙ্কুচিত হয় এবং যে অংশ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তাহা প্রসারিত হয়। কিন্তু এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তির পরেও চলিতে থাকে; সুতরাং পূর্ব্বে যাহা প্রসারিত হইয়াছিল তাহা অতিরিক্ত সঙ্কুচিত এবং সঙ্কুচিতাংশ অতিরিক্ত প্রসারিত হয়। ইহার সংশোধনের জন্য আবার সঙ্কুচিতাংশে প্রসারণ ও প্রসারিতাংশে সঙ্কোচন আরব্ধ হয়। এই আন্দোলন-নৃত্যও এইরূপে অনেকক্ষণ চলে।

শব্দের মূল যে কম্পন তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। কোন বস্তু কাঁপিতে থাকিলে নিকটবর্ত্তী বায়ুও তাহার আঘাতে কম্পিত হয়, বায়ুর কম্পন সঙ্কোচন ও প্রসারণ রূপে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়; সেই কম্পন যথেষ্ট দ্রুত হইলে ও কর্ণপটহে তাহার আঘাত লাগিলে

তৎসংলগ্ন স্নায়ুর মধ্য দিয়া উহা মস্তিষ্কে নীত হইলেই শব্দের জ্ঞান জন্মে। এ কম্পনেরই বা কত রকম। কম্পনের দ্রুতত্বের বিভিন্নতায় বিভিন্ন সুর জন্মে এবং শক্তির তারতম্য বশতঃ শব্দ উচ্চ বা মৃদু হইয়া থাকে। আবার যে যে সুরের মিল আছে তাহার মিশ্রণে মধুর স্বর এবং অমিল সুরের মিশ্রণে কর্কশ শব্দের উৎপত্তি হয়। এবং এই মিশ্রণের পার্থক্য বশতঃ বিভিন্ন যন্ত্রের শব্দের পার্থক্য লক্ষিত হয়। একটী তারযুক্ত যন্ত্রের বাদন কালে তারের কম্পন লক্ষ্য করিয়া দেখুন; আহত স্থান হইতে একটী ঢেউ প্রান্তের দিকে ধাবিত হয়, আবার সেখান হইতে ফিরিয়া আসে, এইরূপ চলিতে থাকে। ঘণ্টার কম্পন অন্য প্রকার, বাঁশীর কম্পন আবার অন্যরূপ, ইত্যাদি।

শাব্দ কম্পন যে কেবল বায়ুর মধ্য দিয়াই চলে, এমন নহে, উহা অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকল পদার্থের মধ্য দিয়াই চলিতে পারে; বরং অনেক তরল ও কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়া বায়ু অপেক্ষাও ভালরূপে এবং অনেক বেশী দ্রুতবেগে চলে। ছেলেরা যে খেলার টেলিফোঁ প্রস্তুত করে তাহা এ কথার সাক্ষী।

আবার বিভিন্ন প্রকার শাব্দ কম্পনের বিচিত্র মিশ্রণেই স্বর ব্যঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি। এই তত্ত্ব হইতে ফোনোগ্রাফ গ্রামোফোন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। এক খান বিস্তীর্ণ পর্দ্দার সহিত একটী সূচী সংলগ্ন করিয়া তাহার সম্মুখে কোনরূপ শব্দ করিলে পর্দ্দাটী

ঠিক তদনুযায়ী ভাবে কাঁপিতে থাকিবে. সূচীর অগ্রভাগও সুতরাং সেইরূপ ভাবে কাঁপিবে। এখন কোনও কোমল পৃষ্ঠ সেই সূচীর অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া ঘুরিতে থাকিলে তাহাতে তদনুরূপ দাগ পড়িবে ; এইরূপে 'রেকর্ড' প্রস্তুত হইল। সেই রেকর্ডের দাগের উপরে আবার একটী পর্দ্দা-লগ্ন সূচী রাখিয়া রেকর্ডটী পূর্ব্ববৎ দ্রুত-বেগে ঘুরাইলে পর্দ্দাটী পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে থাকিবে এবং তাহা হইতে পূর্ব্ববৎ স্বর-তরঙ্গ বাহির হইবে। তবে শক্তির অল্পতাবশতঃ সে স্বর অনেক মৃদু হইবে ; গ্রামোফোন যন্ত্রে সে মৃদুতা দূরীকরণেরও বন্দোবস্ত থাকে। আরও খুঁটিনাটি অনেক আছে, কিন্তু স্থূল কথা এই।

সঙ্গীত এক অতি চমৎকার নৃত্য। ইহাতে শব্দজনক নৃত্য ত আছেই, তা ছাড়া শাব্দ নৃত্যের নানাবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের উৎপত্তি হয়। কণ্ঠো-দ্ভব সঙ্গীতই হউক, আর যে কোন প্রকার যন্ত্রোদ্ভব সঙ্গীতই হউক, সর্ব্বত্রই এই কথা খাটে। শব্দলহরী তালে তালে চলিতে থাকে এবং মনে নানাবিধ ভাব উদ্বেলিত করিতে থাকে।

যে সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য গতির কথা এ পর্য্যন্ত বলা হইল, সে সকলই ক্রমে থামিয়া যায় ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই খানেই নৃত্যের অবসান হয় না ; স্থূল দ্রব্য বা দ্রব্যাংশের নৃত্য সূক্ষ্ম আণবিক নৃত্যে পরিণত হয় ; তাহারই বহিঃপ্রকাশ 'তাপ'।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সকল পদার্থই অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশে বিভক্ত। সেই অংশগুলির নাম 'পরমাণু'। আবার যৌগিক পদার্থে, অর্থাৎ যে সকল পদার্থ বিভিন্ন প্রকার পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন, তাহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু দলবদ্ধ হইয়া থাকে; ইহাদের এক একটী পরমাণু-দলের নাম 'অণু'। এই অণুগুলি পরস্পর সংলগ্ন নহে; এক একটী অণুর মধ্যে পরমাণুগুলিও পরস্পর সংলগ্ন নহে; তাহাদের মধ্যে ফাঁক আছে। সেই ফাঁকের মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা কাঁপিতেছে, কখনও স্থির হইয়া থাকে না। এই কম্পনের দ্রুতত্বের আধিক্য বা অল্পতা অনুসারে জিনিষের উষ্ণতার আধিক্য বা অল্পতা লক্ষিত হয়। কিন্তু এই কম্পন একেবারে নাই, এমন পদার্থের অস্তিত্ব কোথাও নাই বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না; কারণ এইরূপ কম্পন এক অণু হইতে পার্শ্ববর্ত্তী অপর অণুতে ত সঞ্চারিত হয়ই, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পদার্থ হইতে দূরবর্ত্তী পদার্থান্তরেও বিকীর্ণ হইতেছে; সুতরাং অতি শীতল দ্রব্যও অন্যত্র হইতে কিছু কিছু তাপ প্রাপ্ত হওয়াতে সম্পূর্ণ শীতল হইতে পারে না।

এখন এই আণবিক নৃত্যের একটা চিত্র মনে ধারণা করিতে চেষ্টা করুন। বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু যেন বিভিন্নাকৃতি-বিশিষ্টা নর্ত্তকী। ইহারা এক এক পদার্থে এক এক প্রকারে হাত-ধরাধরি করিয়া আছে। হস্তগুলি অবশ্য জড় হস্ত নহে, রাসায়নিক বন্ধন

(bonds) মাত্র। এই হাত ধরাধরির প্রণালীটাও রসায়নবিদ্‌গণ অধিকাংশ স্থলে একপ্রকার স্থির করিয়াছেন এবং পদার্থের Constitutional formulæ দ্বারা তাহা প্রকাশ করেন। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রাসায়নিকগণ বলেন, হাইড্রোজেন-পরমাণু এক হস্ত বিশিষ্ট, অক্‌সিজেন দ্বিহস্ত, নাইট্রোজেন পঞ্চহস্ত, ইত্যাদি। জলের অণুতে একটি অক্‌সিজেন-পরমাণু দুই হাতে দুইটী হাইড্রোজেন-পরমাণু হস্ত ধরিয়া আছে। নাইট্রিক এসিডের অণুতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু দুই হস্তে একটী অক্‌সিজেন পরমাণুর দুই হাত, আর দুই হাতে আর একটী অক্‌সিজেন-পরমাণুর দুই হাত, এবং অবশিষ্ট পঞ্চম হস্তে তৃতীয় আর একটী অক্‌সিজেন-পরমাণুর এক হাত ধরিয়াছে, আর শেষোক্ত অক্‌সিজেন-পরমাণু অপর হস্তে একটী হাইড্রোজেন-পরমাণুর হাত ধরিয়া আছে। অথবা নাইট্রোজেন-পরমাণুর দুই হাত পরস্পর যুক্ত, আর তিন হাতে তিনটি অক্‌সিজেন-পরমাণুর এক এক হাত ধরিয়া আছে, এবং উক্ত অক্‌সিজেন-পরমাণুত্রয়ের দুইটি অপর হস্তে পরস্পরকে ধরিয়াছে, আর তৃতীয়টি একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু ধরিয়া আছে। এইরূপ এক এক জিনিসে এক এক রকম।

এইরূপে সম্বদ্ধ হইয়া পরমাণুর দল অনন্ত নৃত্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সে নৃত্যের প্রকার অসংখ্য। আবার এই অণুগুলিও প্রায়ই একেবারে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে নৃত্য করে না।

যখন তাহারা পরস্পরের আপেক্ষিক অবস্থান (Relative position) মোটের উপর ঠিক রাখিয়া নৃত্য করে, তখন পদার্থের কঠিন অবস্থা দেখিতে পাই। যখন তাহাদের আপেক্ষিক অবস্থার ঠিক থাকে না, অণুগুলি স্থান পরিবর্ত্তন করে, তখন তরল অবস্থা হয়। আর যখন তাহারা নৃত্যে এমন মত্ত হয় যে, তাহাদের সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থানও যেন অসহ্য হয়, তাহারা ছড়াইয়া পড়িতে ব্যাকুল হয়, তখনই বাষ্পীয় অবস্থা ঘটে; কখন কখন অণুগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণও ঘটে। আবার কখন কখন বিভিন্ন পদার্থের অণু পরস্পর কাছাকাছি আসিলে তাহাদের অণুমধ্যস্থ পরমাণুগুলি নূতন রকমের অণুর দল বাঁধে; ইহারই নাম রাসায়নিক ক্রিয়া। কখন কখন আবার অণুগুলি বিশেষ প্রকারের শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত হয়। এইরূপ শৃঙ্খলার ফলে দানাদার crystaline জিনিসের দানা উৎপন্ন হয়। এই শৃঙ্খলারও নানা রকম আছে, তাই এক এক জিনিসের এক এক রকম দানা। চুম্বক ও তাড়িতের দ্বারাও এইরূপ শৃঙ্খলা সাধিত হয়। এক খণ্ড কোমল লৌহের নিকটে একটি চুম্বক-দণ্ড আনিলে তদ্দ্বারা ঐ লৌহখণ্ডে যে আণবিক শৃঙ্খলা হয়, তাহা চুম্বক-দণ্ডটি সরাইয়া নিলেই ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু ইস্পাতে ঐ শৃঙ্খলা স্থায়ী হয়, সহজে ভাঙ্গে না। ধাতুনির্ম্মিত তারের কুণ্ডলীর (coil'এর) মধ্য দিয়া তাড়িত-প্রবাহ চালিত করিলেও উহা ঠিক চুম্বকের ন্যায় কার্য্য করে। আবার

কোনও তরল পদার্থের দুই স্থান তাড়িত-যন্ত্রের দুই প্রান্তের সহিত সংযুক্ত করিলেও উক্ত দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী অণুগুলিও সুশৃঙ্খল-ভাবে সজ্জিত হয় এবং তাহাদের একটীর পরমাণু নিকটতম অন্যটীতে সঞ্চারিত হইতে থাকে।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঈথর-সমুদ্রে ভাসমান অণু ও পরমাণু সমূহের এই নৃত্য ঈথরকেও কাঁপাইয়া তোলে, এবং ঈথরের মধ্য দিয়া তাহার তরঙ্গ দূরদূরান্তরে বিস্তারিত হয়। ইহাই তাপ ও আলোক বিকীরণের প্রণালী। যে সকল ঈথরিক কম্পনের দ্রুতত্ব এমন যে, আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়-সংলগ্ন বিশেষ প্রকারের স্নায়ুকে কম্পিত করিয়া তোলে, এবং স্নায়ু-কম্পনের ঢেউ মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহাদের দ্বারা আলোক-জ্ঞান জন্মে। ঈথরিক কম্পন-নৃত্যেরও অনেক প্রকার ভেদ আছে। সাধারণ কম্পনে নানাবিধ কম্পনের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সে কম্পন একবিধ আকার ধারণ করে, তখন তাহা নিয়মিত (polarised) হইল, বলা হয়। কোন কোন স্বচ্ছ পদার্থেরই মধ্য দিয়া আসিবার সময়, এবং কোন কোন পদার্থে প্রতিফলিত হইলে ঈথরিক কম্পনকে নিয়মিত হইতে দেখা যায়।

ঈথরিক কম্পন কোনও বস্তুতে প্রতিহত হইলে তাহার মধ্যে আণবিক কম্পন উৎপাদন করে, ইহা বলা হইয়াছে। সে কম্পন স্থলবিশেষে এমন হয় যে, ঐ বস্তুতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত

হয়। উদ্ভিদের সবুজ পত্র এইরূপে বাতাসের অঙ্গার বাষ্প (কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্) হইতে অঙ্গার (Carbon) গ্রহণ করে এবং বাতাসকে অক্সিজেন ফিরাইয়া দেয়। ফটোগ্রাফিরও মূল তত্ত্ব ইহাই। যন্ত্রের (Camera) অভ্যন্তরে একখণ্ড কাচে এমন একটা জিনিস মাখান থাকে, যাহার উপরে ঈথরিক কম্পন-তরঙ্গ পতিত হইয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটায়। আলোকের (ঈথরিক কম্পনের) তারতম্যানুসারে সে পরিবর্ত্তনেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ঐ কাচখণ্ডের উপর যে পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাতে তদনুরূপ দাগ পড়ে।

কি অণু কি ঈথর, কিছুই কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। ইহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয়, তাহা প্রত্যক্ষগোচর ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা স্বরূপ অনুমান মাত্র। কিন্তু এ সকল অনুমানের পোষক এত বহুসংখ্যক ও বহুবিধ ঘটনা বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, যে এগুলির অধিকাংশ প্রায় নিশ্চিত বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। এখন আবার অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন, পরমাণুগুলিও ঈথরের ঘূর্ণাবর্ত্ত মাত্র। যদি এ অনুমান ঠিক হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, জড়-জগতে ঈথর ও তাহার নৃত্য ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এখন নির্জীব জগৎ ছাড়িয়া সজীব জগতে জীবনী-ক্রিয়ার নৃত্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক। জীবদেহে ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের নৃত্য সকলেরই প্রত্যক্ষ। রক্তও যে ঝলকে ঝলকে নৃত্যের

ন্যায় গতিতেই প্রবাহিত হয়, তাহাও সকলেই জানেন। এই সকল ও অন্যান্য কম্পনের ফলে সমস্ত শরীরই সর্ব্বদা কম্পিত ও স্পন্দিত হইতেছে। উদ্ভিদ্‌দেহে রস-সঞ্চারণও অনেকটা রক্ত-সঞ্চারণেরই অনুরূপ, তবে এস্থলে ঝলকগুলি তত স্পষ্ট ও পৃথক্ নহে। তাপ ও আলোকের প্রভেদ বশতঃ কি অন্যান্য কারণে উদ্ভিদ্-দেহে আরও নানাবিধ গতি উৎপন্ন হয়। সে সকলই অল্পাধিক প্রত্যাবর্ত্তন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহে শ্বাস-নালীতে এক প্রকার সূত্রাকার পদার্থ সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে;—এবং শ্লেষ্মা অথবা অপর কোন অবাঞ্ছনীয় বস্তু শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করে। বাক্যোচ্চারণ কালে স্বর-তার (Vocal cords) হইতে আরম্ভ করিয়া মুখের বিভিন্নাংশের নানাবিধ নৃত্য সহজেই অনুভব করা যায়। গানের সময় আবার সে নৃত্য বিশেষ ভাবে নিয়মিত হইয়া অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব লাভ করে। পান, আহার ও মলাদির ত্যাগ পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণের তরঙ্গ দ্বারা সাধিত হয়, সেও এক প্রকার নৃত্য। অন্যান্য পেশীর স্পন্দনও সময়ে সময়ে সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ তাহাকে শুভ বা অশুভের চিহ্ন মনে করিয়া উৎফুল্ল অথবা ম্রিয়মান্ হন। চক্ষুর নিমেষও পেশীর নৃত্যের উদাহরণ। স্নায়বিক স্পন্দনের ঢেউ মস্তিষ্কে নীত হইয়া এবং তথা হইতে বিভিন্ন অঙ্গে চালিত হইয়াই অনুভব ও কার্য্যক্ষমতা উৎপাদন করে। সুখ, দুঃখ, প্রেম, দ্বেষ, বিনয়,

অহঙ্কার, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রত্যেক মানসিক ভাব, প্রত্যেক চিন্তা, ইচ্ছা, স্মৃতি প্রভৃতির সহিত মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানের বিশেষ প্রকার নৃত্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আবার, খাদ্যদ্রব্য মুখ-গহ্বরে প্রদানে নৃত্য, চর্ব্বণে নৃত্য, অধঃকরণে নৃত্য,—সেখানেই নৃত্যের বিরাম হয় না, উহা পাকস্থলীতে গিয়া তথাকার রসের সহিত মিলিত হইয়া এক অদ্ভুত নৃত্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহা দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যখন তাহা অন্ত্রের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, তখনও রাসায়নিক ক্রিয়ার নৃত্য চলিতে থাকে। বাস্তবিক প্রত্যেক শারীরিক ক্রিয়াই নৃত্যের আকারে সম্পাদিত হয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তার পর, জীব ও উদ্ভিদ দেহ যে cell নামক সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত, সেই cell-গুলিরও ধর্ম্ম—স্পন্দন, অথবা অন্য কথায় নৃত্য। সে নৃত্যও নানা রকমের। ইহারা কখনও এক বা অধিক হস্ত প্রসারিত করে এবং সেই হস্তগুলি নানাভাবে আন্দোলিত ও রূপান্তরিত করে, কখনও বা জলৌকা বা মহীলতার ন্যায় প্রসারণ ও সঙ্কোচন দ্বারা ইতস্ততঃ চলিতে থাকে, কখনও অচেতন অথবা চেতন খাদ্য জড়াইয়া ধরে এবং আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা তাহাকে আপন দেহাংশে পরিণত করে, আবার কখনও বা বিভক্ত হইয়া বংশ-বিস্তার করে; ইত্যাদি নানাবিধ চেষ্টা ইহাদের মধ্যে দেখা যায়।

নৃত্য জীবসমূহের আহারাদির মত স্বাভাবিক। মৎস্য, পক্ষী ও

পশুবিশেষের নৃত্য প্রসিদ্ধই আছে। জীব সুখেও নৃত্য করে, দুঃখেও নৃত্য করে। আমরা বিড়াল-কুক্কুরাদির নৃত্যকে নৃত্য না বলিয়া খেলা বলি, কিন্তু নৃত্যের লক্ষণ সেখানেও বর্ত্তমান। ইতর প্রাণীর মধ্যে কোন কোন স্ত্রীজীবের নিকট প্রণয়প্রার্থী পুরুষ-জীবের নৃত্য সৃষ্টি-কৌশলের এক অপূর্ব্ব খেলা।

মানুষ ত অত্যন্ত নৃত্যপ্রিয়। অতি শিশুও হাত পা নাচায়। শিশু আর একটু বড় হইলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা বা রোগের উদ্বেগ বেশী না থাকিলে অধিকাংশ সময় নাচিয়াই কাটায়। সভ্য অসভ্য, কোন্ জাতিতে অধিক বয়স্ক লোকের মধ্যেও নৃত্যের প্রাচুর্য্য নাই, অথবা কখনও ছিল না? জীবন-সংগ্রামের পরাভবে নিষ্পেষিত হইয়া আমরাই কেবল নাচি না অথবা কদাচিৎ নাচি। ইহাই দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :—

"আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কেগো দিবে এই তৃষিতে?
জগৎ-মাতানো সঙ্গীত-তানে,
কে দিবে এদের নাচায়ে?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে?"

হায়! কবে আমরা জীবন ফিরিয়া পাইব? কবে এ জগতের নৃত্য আমাদিগকেও নাচাইয়া তুলিবে? ভরসা এই, আমরা না নাচিলেও নৃত্যগীতে একান্ত বীতস্পৃহ হই নাই, সুতরাং একেবারে জীবনহীন হই নাই। জীবনের যে স্তম্বটী এখনও রহিয়াছে, উপযুক্ত জলসেক করিলে এবং মুক্ত বাতাস ও দিবালোক পাইলে তাহা আবার পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইতে পারে।

যাক্ সে কথা। বলিতেছিলাম, নৃত্য মানুষের পক্ষেও স্বাভাবিক। মানুষ নৃত্যকে কলাবিদ্যার (Art-এর) অন্তর্ভূক্ত করিয়াছে। নৃত্যের মধ্য দিয়া কিরূপে বিচিত্র সৌন্দর্য্য, নানাবিধ ভাব ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহা তাহারা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করে।

কিন্তু যাহাকে আমরা নৃত্য নাম দেই, তাহাই কি কেবল নৃত্য? যাহাকে আমরা হাটা বা দৌড়ান বলি, তাহাও কি নৃত্য নহে? ভাবিয়া দেখিলে সে সকলই নৃত্য, নৃত্যের সকল লক্ষণই তাহাতে বর্ত্তমান। দেহ যেমন অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পাদক্ষেপে তাহা একবার একটু উর্দ্ধে উঠে আবার নীচে নামে। হস্তদ্বয়ের যেমন পর্য্যায়ক্রমে অগ্র-পশ্চাৎ গতি দেখা যায়, শরীরের উভয় পার্শ্বেরও সেইরূপ একটু অগ্র-পশ্চাৎ গতি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত শরীর অল্পাধিক কাঁপিতে থাকে। তবে অতি সাধারণ বলিয়া এবং কলা-কৌশল-হীন বলিয়া

তাহাকে নৃত্য বলে না। সময়বিশেষে, যাহার চলনে বিশেষ মাধুর্য্য লক্ষিত হয়, তাহার চলাকেও নৃত্য নাম দেওয়া হয়।

বাহির ছাড়িয়া ভিতরে মনোরাজ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই, সেখানেও কেবলই নৃত্য। উৎসাহে ও আনন্দে মন নাচিয়া উঠে, ভয়ে প্রাণ কাঁপিতে থাকে, এ সকল প্রসিদ্ধ কথা ; চিন্তাকে সর্ব্বদাই তরঙ্গের সহিত উপমা দেওয়া হয় ; এ সকল কথা যে অর্থ-হীন, ইহা বোধ হয় কেহ বলিবেন না। শারীর-বিদ্যাবিদ্‌গণ বলেন, মানসিক ক্রিয়া মাত্রেরই সহিত মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকার নৃত্যের নিত্যসম্বন্ধ। মস্তিষ্কে যাহা নৃত্যরূপে প্রকাশ পায় তাহা নিশ্চয়ই নিজেও এক প্রকার নৃত্য হইবে। যাঁহারা মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্ মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতাবলম্বনে এ কথা বলি-লাম। এমনও অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের মতে মস্তিষ্ক হইতে পৃথক মন বলিয়া একটা কিছু নাই। আমি কোনও মতের সহিত বিবাদ করিতে চাই না। যে মতই অবলম্বন করা যাউক, মানস-ক্রিয়ামাত্রেই নৃত্য আছে বলা যায়। চিন্তা, আবেগ, ইচ্ছা, এ সকলেরই যে জোয়ার ভাটা আছে, এগুলি যে এক একবার তীব্র, আর এক এক বার মৃদু ভাব ধারণ করে, তাহাও সকলেই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আবার সময়ে সময়ে বিভিন্ন মনো-ভাবের মধ্যে একবার একটী সম্মুখে আসে, আর একটী পশ্চাতে সরিয়া যায়, আবার আর একটী পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসে, সম্মু-

খের ভাবটী পশ্চাতে অপসৃত হয়, ক্রমাগতই এইরূপ ভাবে নৃত্য চলিতে থাকে। একটী গানে আছে "কত অভিনব ভাব-তরঙ্গ ডুবিছে, উঠিছে, করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।" দুঃখের, অবসাদের সময়েও এ নৃত্য একেবারে থামে না।

পৃথক পৃথক ব্যক্তির মনোরাজ্যেই যে কেবল এইরূপ নৃত্য চলিতে থাকে তাহা নহে। সমষ্টির মনোরাজ্যেও এই ঘটনা দেখা যায় না। এক একটা সময় আসে যখন এক একটা বিশেষ ভাব সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আবার কিছু দিন পরে তাহা সরিয়া যায়, আর একটা ভাব তাহার স্থান অধিকার করে। এক সময়ে চতুর্দ্দিকে কবিত্বের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে, আবার কিছু দিন পরে উচ্চ দার্শনিক চিন্তা তাহার স্থানে দেখা দেয়; কখনও বিশ্বাসের বন্যা বহিতে থাকে, আবার সন্দেহ বাদ, নাস্তিকতা আসিয়া তাহাকে ডুবাইবার উপক্রম করে; কখনও জ্ঞানের মহিমা বিঘোষিত হইতে থাকে, আবার কখনও সর্ব্বত্র লোকে ভক্তিরসে বিভোর হয়; বিশেষ বিশেষ সমাজের সমষ্টি-জীবনে ত এইরূপ বিভিন্ন ভাবের খেলা অতি স্পষ্ট ও ইতিবৃত্তানুসন্ধায়িগণের নিত্য লক্ষ্যের বিষয়; প্রায় সমগ্র জগদ্‌ব্যাপী মানব-জাতির সমষ্টি-জীবনেও এইরূপ ঘটনা অনেক সময় লক্ষিত হইয়া থাকে। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

ভারতীয় আর্য্যজাতির ইতিহাস আলোচনা করুন। অতি

প্রাচীনকালে যজ্ঞপ্রধান বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া যখন অরণ্যের বাহিরে প্রাণহীন ক্রিয়া-কলাপে পরিণত হইতে চলিল, তখন বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তাহাকে দলিত করিয়া আর্য্যজাতির ধর্ম্মভাবকে নূতন জীবন দান করিল। দেশ-বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের এরূপ আয়োজন মানবজাতির ইতিহাসে তৎপূর্ব্বে যে কখনও হইয়াছে, এরূপ কোথাও জানা যায় না এবং সম্ভবও বোধ হয় না। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও আচার পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে এ দেশ হইতে অপসৃত হইল। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে এই ইংরেজ-আমলে কত পরিবর্ত্তন, দেখুন। এক সময় দেখিবেন, সত্য ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার সহিত ইংরেজানুকরণে মদ্য-মাংসাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সামাজিক বিদ্রোহ ও যথেচ্ছাচার প্রবল হইয়া উঠিতেছে; আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ভাব, নূতন নৈতিক বল সমাজ মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে; তখন অনেকে মনে করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারপূর্ণ, পৌত্তলিকতা মহাপাপ; এই সকল মতের জন্য কত লোকে কত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন; আবার সে দৃশ্য বদলিয়া গেল, এখন পৌত্তলিকতার দার্শনিক সমর্থন আরম্ভ হইল, হিন্দুশাস্ত্রের নূতন অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, আর ব্রাহ্মসমাজের দিকে লোক তত আকৃষ্ট হয় না, বিলাত-প্রত্যাগতগণও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু-সমাজে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত, পক্ষান্তরে হিন্দুসমাজও পূর্ব্ব-সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া উদার

ভাবে সকলকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। বিশেষ বিশেষ সমাজে নূতন নূতন ভাবের ঢেউ যেমন স্পষ্ট, জাগতিক ভাবের ঢেউ তত স্পষ্ট, তত পরিষ্কার হইতে পারে না। কিন্তু তাহাও সময় সময় বেশ দেখা যায়। প্রায় সমান সময়ে ইউরোপে লুথর, ক্যাল্‌ভিন প্রভৃতি এবং ভারতে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক ধর্ম্মে নূতন জীবন ও নূতন ভাব-সঞ্চার এবং বর্ত্তমান সময়ে জাপান, তুরস্ক, পারস্য, পর্ত্তুগাল স্থানে বিশেষতঃ, এবং অন্য কোন কোন দেশেও অল্পাধিক পরিমাণে—রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রজাসাধারণের অধিকার-বৃদ্ধি ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সকল পরিবর্ত্তনের কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার এস্থলে কোনও প্রয়োজন নাই। পরিবর্ত্তনরূপ নৃত্য চলিতেছে, ইহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য।

এখন সহানুভূতির নৃত্যের কথা বলিব। চেতন জগতে এক-জনের আনন্দ দেখিলে আর একজনের মনও নাচিয়া উঠে, একের দুঃখে অপরের অন্তরে ক্রন্দনের ঢেউ উত্থিত হয়, ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ বিষয়। একটি সঙ্গীত শুনিয়া বা একটী চিত্র দেখিয়া লোকে কেমন উত্তেজিত হয়! জীব ও উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যেও আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে—এক অঙ্গের সুখ বা অসুখ যেন সমস্ত শরীরেই উপলব্ধ হয়। নির্জ্জীব-জগতেও সহানুভূতির অভাব নাই। অনুভূতি শব্দে যদি কেহ আপত্তি করিতে চান, করিতে

পারেন ; কিন্তু তাহাদের ব্যবহার যে অনুভূতির অনুরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র একই সুরে বাঁধা থাকে, তবে তাহার একটী বাজাইলে অন্যগুলিও বাজিয়া উঠে। বাদ্য-যন্ত্রের তার বাজিতে থাকিলে, তাহার কাষ্ঠও সেই বাদনে যোগ দেয়। শুনিয়াছি, কেথায় নাকি ঢাকের বাদ্যে যোগ দিতে গিয়া একটি মন্দির অথবা তন্মধ্যস্থ বায়ু এমন নাচিয়া উঠিয়াছিল যে অবশেষে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। টেলিগ্রাফের তারের একদিকের কলে যে ভাবে আঘাত করা যায়, অপরদিকের কলটিও ঠিক সেই ভাবে নাচিয়া উঠে। এখন ত তারহীন টেলি-গ্রাফিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক বসুর আবিষ্ক্রিয়ার কথা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তথা-কথিত অচেতন পদার্থের সহানু-ভূতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগের আলোচনা করা যাউক, সেখানেই দেখিতে পাই অবিরাম নৃত্য চলিতেছে। মনস্বিপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সার দেখাইয়াছেন, ইহা শক্তির নিত্যত্বের অবশ্যম্ভাবি ফল। সুতরাং এ নৃত্য রূপান্তরিত হইতে পারে, বিলুপ্ত হইতে পারে না।

কেহ হয় ত বলিবেন, 'যাহাতে চতুর্দ্দিকে হাহাকার উত্থিত হয়, কত জীবের কত লোকের প্রাণনাশ হয়, সে আবার কেমন নৃত্য ?

তাহা কি নৃত্য নামের যোগ্য ?' এ আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। রণজয়ী বীরবাহিনীর তাণ্ডব-নৃত্যের ত কথাই নাই, সুন্দরীর সবিলাস কোমল লাস্যেও হয়ত কোনও কীটানুরাজ বিধ্বস্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা ভাবিয়া কি তাহাকে নৃত্য বলিব না ? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিকট মানুষ আর কীটাণুতে প্রভেদ কি ? আমরা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ভাবি, একজন W. T. Stead-এর জীবন-নাশে জগতের কতই ক্ষতি ; কিন্তু প্রকৃতিদেবীর চক্ষে মানুষের সেরূপ কোনও প্রাধান্য নাই। তাঁহার বিধি সর্ব্বত্র সমান পক্ষপাত-শূন্য ভাবে প্রযুক্ত হয়। সেই বিধিরই বশবর্ত্তী হইয়া মূর্খ মানুষ কখনও ভাবে, 'আমরা প্রকৃতিকে জয় করিয়াছি,' বাস্তবিক সেখানেও প্রকৃতিরই জয় ; আবার কখনও প্রকৃতিকে নির্ম্মম, জড় প্রভৃতি বলিয়া গালি দেয়, সেও প্রকৃতিরই খেলা।

এমন আপত্তিও হইতে পারে,—"দুঃখের নৃত্য কিরূপ ? ক্রোধ বা ভয়ের কম্পনকেও কি নৃত্য বলিব ?" তাহাতে নৃত্য শব্দের অপব্যবহার হয় না কি ?" ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই,— যখন আমরা বলি, 'আমার বামচক্ষু নাচিতেছে,' 'সে রাগিয়া আমার নিকট হাত নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, ইত্যাদি,' তখন সে নাচার সহিত সুখ বা আনন্দের কোন সম্বন্ধ কল্পনা করি না, বরং প্রথম নৃত্যের সহিত অনেক স্থলে বিষাদের এবং দ্বিতীয়ের সহিত ক্রোধেরই সম্বন্ধ সূচিত হয়। সুতরাং দুঃখ ক্রোধাদির সহিত সম্বন্ধ-

যুক্ত নৃত্য হইতে পারে না, এমন নহে। তার পর, দুঃখ যে কেবল অবসাদই জন্মায়, তাহা নহে ; দুঃখের স্বর বরং সাধারণ স্বর অপেক্ষা অধিক কম্পিত হয়। আর, বেদনাদিপ্রযুক্ত অনেক সময় লোকে বাস্তবিকই নাচিয়া থাকে।

মুক্ত পুরুষের নিকট সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভয়, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সকলি এক বিশ্বলীলার বৈচিত্র্য মাত্র ; তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। সুতরাং তিনি সকল প্রকার স্পন্দন, কম্পন, আন্দোলন, ঘূর্ণন, ধাবনাদিকেই নৃত্য বলিতে পারেন। উল্লিখিত আপত্তি তাঁহার মনে স্থান পায় না। আর এইরূপ মুক্ত পুরুষই প্রকৃত সত্য গ্রহণে সমর্থ। সুখ-দুঃখ ও রাগ-দ্বেষের রঙ্গিল নেত্রাবরণ আমাদিগকে জিনিষের প্রকৃত বর্ণ দেখিতে দেয় না।

অতএব দেখা গেল, সর্ব্বত্রই নৃত্য, নৃত্য, নৃত্য; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নৃত্যময়। দেশ ও কাল এই নৃত্যেরই সৃষ্টি ; শিশু নাচিয়াই দেশকে জানে ; মনোবিজ্ঞানের কারণ ও কার্য্য নৃত্যদ্বারাই পরস্পর সম্বদ্ধ ; কারণের নৃত্যেই কার্য্যের উৎপত্তি। আমরা কিরূপে কি জানি? নৃত্য দ্বারা নৃত্যকেই জানি, যদিও তাহাকে অনেক সময় নৃত্য বলিয়া চিনিতে পারি না। আমরা কিরূপে কি ইচ্ছা করি? এক নৃত্য দ্বারা অন্য নৃত্যের সহিত মিলিত বা বিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করি, যদিও তাহাকে অনেক সময় নৃত্য বলিয়া বুঝিতে পারি না। আমাদের সুখ কি?—বাহ্য

•নৃত্যের সহিত আভ্যন্তরীণ নৃত্যের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যজনিত আভ্যন্তরীণ নৃত্যবিশেষ মাত্র। নৃত্য ভিন্ন বুঝি আর কিছুই নাই।

বিশ্বের এই মহানৃত্যের সামান্য আভাস দিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু, হায়! আমার কৈ তদুপযোগিনী সহৃদয়তা? আমি কোন্ ছার,—বুঝি কোনো মানুষের তাহা সাধ্য নহে! রবীন্দ্রনাথ তাহাই ভাবিয়া গাহিয়াছেন—

"বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে কে বাজাবে সেই বাজনা!
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য বিস্মৃত হয়ে আপনা!
হৃদয়-সাগরে পূর্ণ চন্দ্র জাগাবে নবীন বাসনা!

* * * *

হা হা করি সবে উচ্ছল রবে চঞ্চল কলকলিয়া,
চৌদিক হ'তে উন্মাদ স্রোতে আসিবে তূর্ণ চলিয়া!
ছুটিবে সঙ্গে মহাতরঙ্গে ঘিরিয়া তাঁহারে হরষ-রঙ্গে
বিঘ্ন তরণ-চরণ-ভঙ্গে পথ কণ্টক দলিয়া!"

কিন্তু মানুষের পক্ষে এ বাজনা অসম্ভব হইলেও, তাহা বাজিতেছে। ভক্ত গাহিয়াছেন, "বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন।" প্রকৃত প্রেমিক না হইলে এ সঙ্গীত শুনিবার শক্তি জন্মে না। সে প্রেম কোথায় মিলে? সে যে অতি দুর্লভ সম্পত্তি দেবানুগ্রহ ভিন্ন তাহা কে পাইতে পারে? সাধারণ মানুষ সে অনুগ্রহের নিতান্ত অযোগ্য। কিন্তু তথাপি তাঁহার এমনি দয়া যে

তাহার কিছু না কিছু স্বাদ সকলেই সময়ে সময়ে পাইয়া থাকে এবং প্রেম কি পদার্থ তাহারও কতকটা আভাস বুঝিতে পারে। তখন সেই মহাবাদ্যেরও অস্পষ্ট ধ্বনি কর্ণে আসিয়া পৌঁছে। সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ পরক্ষণে বলিতেছেন :—

"ওগো কে বাজায় (বুঝি শুনা যায়),

মহারহস্যে রসিয়া,

চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে অম্বরপথে বসিয়া।"

এমন শুভ মুহূর্ত্ত সকলের ভাগ্যেই কখন কখন উপস্থিত হয়। তখন "মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" সমস্ত জগৎ মধুময় হয়। হায়! সে মুহূর্ত্ত স্থায়ী করিবার চেষ্টা করি কৈ? পরক্ষণেই সংসার-বাত্যায় আমাদিগকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়।

কিন্তু সে বাজনা কেহ শুনুক কি না শুনুক, সে নৃত্য কেহ দেখুক কি না দেখুক, নিখিল-বিশ্ব বিশ্বপতির এই নিত্য-আরতিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই। কারণ 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি.'—তিনি রস-স্বরূপ, বিশ্ব সেই রস পাইয়া আনন্দযুক্ত হয়। ধন্য তিনি, যিনি এই আরতিতে জানিয়া শুনিয়া যোগ দিয়া চরিতার্থ হন।

অথবা, ইহাই ভগবানের অনন্ত রাসলীলা! প্রকৃতি গোপী ভগবানের সহিত অনন্ত-মিলনে মিলিত হইয়া তন্ময়ভাবে মহানৃত্যে

উন্মত্তা। ধন্য সেই প্রেমিক, যিনি এই লীলারস উপভোগ করিতে পারেন; তাঁহার দেখিবার, শুনিবার, জানিবার, পাইবার, কিছুই বাকী থাকে না। অনন্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি—ভূমানন্দ এই খানে।

কিংবা ইহা মহেশ্বরেরই অনন্ত মহাতাণ্ডব। তিনি ত বিশ্বরূপ! বিশ্বই তাঁহার শরীর; বিশ্বের নৃত্যে তাঁহারই নৃত্য দেখা যায়! কি মহাভাবে মগ্ন হইয়া তিনি এমন নাচিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা বোধ হয় এইটুকু বলিতে পারি যে, তাঁহার স্বভাবই নৃত্য করা,—"দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়ম্ আত্মতৃপ্তস্য কা স্পৃহা?" যাঁহার হৃদয়ে এই ভাব প্রতিষ্ঠা-লাভ করে, তিনিও আত্মতৃপ্ত হন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অন্তর হইতে কি বাসনার নৃত্য একেবারে অন্তর্হিত হয়?—কখনই না। তবে সে বাসনা নিষ্কাম, স্পৃহাশূন্য; অভাব-জনিত অতৃপ্তি তাহার নিকটেও স্থান পায় না। মহাদেবের যোগাবস্থাকে 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের' সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রদীপের অস্তিত্বই যে নিত্য-ময়, তাহার দৃশ্যমান নিষ্কম্প অবস্থার মধ্যেও কি চমৎকার নৃত্য চলিতেছে, আর সেই নৃত্যের অবসানে যে প্রদীপেরও অবসান হয়, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখে?

এখন রবীন্দ্রনাথের সহিত এই প্রার্থনা করিয়া উপসংহার করা যাউক -

সেবা

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে বাজুক বিশ্ববাজনা !
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য বিস্মৃত হয়ে আপনা !
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ, নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ !
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র জাগাক নবীন বাসনা !

শ্রীপরেশনাথ সেন।

গন্ধ

মনুষ্য নাসিকার দ্বারা পদার্থের যে গুণ উপলব্ধি করে, তাহাকে গন্ধ বলে।

মনুষ্যেতর প্রাণিগণ এমন অনেক বস্তুর গন্ধ পায়, যাহার কোন গন্ধ মনুষ্য উপলব্ধি করিতে পারে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল পদার্থকে গন্ধদ্রব্য আখ্যা দেওয়া হইল না।

সকল বস্তুর গন্ধ নাই। সুতরাং জড় পদার্থ মাত্রের গুণ গন্ধ বলিলে ঠিক বলা হয় না। ঘন, তরল ও বায়বীয় সকল প্রকার পদার্থের মধ্যে কতকগুলির গন্ধ আছে ও কতকগুলির গন্ধ নাই। যদি ঘন পদার্থকে ক্ষিতি এবং তরল পদার্থকে অপ্‌ ও গ্যাসকে বায়ু সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহা হইলে গন্ধ ক্ষিতির গুণ মাত্র, অপ্‌ বা বায়ুর গুণ নহে, এরূপ বলিলে ঠিক বলা হয় না। অতি প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিতগণ আকাশের গুণ শব্দ ; বায়ুর গুণ স্পর্শ ও শব্দ ; তেজের গুণ রস, রূপ স্পর্শ ও শব্দ ; এবং ক্ষিতির গুণ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ বলিয়া গিয়াছেন।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে অটো ভন্‌ গেরিক (Auto Von Gaerick) বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র আবিষ্কার করার পর পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে,

শব্দ আকাশের গুণ নহে, আকাশে কোন বায়বীয়, তরল অথবা ঘন পদার্থ বর্ত্তমান না থাকিলে কেবল মাত্র আকাশের শব্দ পরিচালনা করার ক্ষমতা নাই। একটী কাচের ঢাকনির ভিতরে একটি কাচের ঘণ্টা ঝুলাইয়া ঐ ঢাকনি টেবিলের উপর রাখিয়া যদি তাহার ভিতরের বায়ু যন্ত্রের দ্বারা টানিয়া নেওয়া যায় তবে ঐ ঘণ্টা তাড়িৎ সংযোগে বা অন্য উপায়ে বাজাইলে কোন শব্দ শুনা যায় না, কিন্তু ভিতরে বাতাস থাকিলে শব্দ শুনা যায়, বিজ্ঞানের ক্লাসে ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। বিশুদ্ধ বায়ুর বা বিশুদ্ধ জলের কোন গন্ধ নাই, ক্ষিতির গন্ধ আছে; সুতরাং অন্য কোন তরল বা বায়বীয় বস্তুর যাহা গন্ধ বলিয়া উপলব্ধি হয় তাহা ক্ষিতির সম্পর্কে হইয়াছে, এই ধারণা বশেই সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐ প্রকার বিভাগ চলিয়া আসিতেছে।

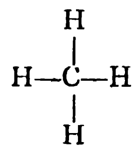
বর্ত্তমান প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চ্চায় গন্ধবস্তু ও গন্ধ সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে বর্ণন করার চেষ্টা করিব।

গন্ধদ্রব্য

উদ্ভিজ্জ গন্ধ-তৈলাদির মূল উপাদান সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথমে জর্ম্মান দেশবাসী ফ্রেডারিক আগষ্ট কেকুলে (Frederic August Kukule) ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ

আকর্ষণ করেন। তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত জীবন জার্ম্মানী, প্যারিস ও লণ্ডনের প্রধান প্রধান রাসায়নিক পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন ও তাঁহাদিগের সহিত দ্রব্যাদির বিশ্লেষণে ও পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকেন; পরিশেষে পুনরায় জর্ম্মানীতে গিয়া গন্ধ দ্রব্যাদির সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্কৃত তথ্য প্রচার করেন। তিনি বহুবিধ গন্ধ-তৈল বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন যে, উদ্ভিজ্জ গন্ধ তৈল মাত্রেরই মূল উপাদনের মধ্যে ৬টী পরমাণু (Atom) বর্ত্তমান ও সেইগুলি একটী অঙ্গুরীয়কের ন্যায় সাজান, এবং ঐ অঙ্গার পরমাণুগুলির প্রত্যেকে এক একটী monovalent পরমাণু অর্থাৎ এক মাত্র বিশিষ্ট পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া গন্ধদ্রব্য উৎপাদন করে। একমাত্র বিশিষ্ট radical অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টি বা অণুর সহিত যুক্ত হইলেও বিভিন্ন প্রকারের গন্ধ-তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার পরীক্ষায় স্থির হয় যে, অঙ্গার পরমাণুর যোগমাত্রা ৪, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর যোগমাত্রাকে ১ ধরিয়া লইলে এক একটি অঙ্গার পরমাণু চারিটী হাইড্রোজেন পরমাণু সহিত যুক্ত হইতে পারে। ইহাতে অঙ্গার পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা চতুর্গুণ ভারি বলা হইল না, বস্তুতঃ অঙ্গার পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ১২গুণ ভারি। অঙ্গারকে ইংরাজীতে (Carbon) কার্ব্বন বলে, এ কারণ তাহার আদ্য অক্ষর C = অঙ্গার পরমাণুবাচক। তদ্রূপ (Hydrogen) হাইড্রোজেনের আদ্য অক্ষর

H = হাইড্রোজেন বাচক। একটী কার্ব্বন পরমাণুর সহিত চারিটী হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হইলে এইরূপ অবয়ব হয়। যথা :—



এই প্রকার সংযুক্ত পরমাণুগুলিকে molecule বা অণু বলে। একটী কার্ব্বন পরমাণুর সহিত চারিটী হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিত হইয়া যে বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাকে মার্শগ্যাস (marsh Gas) অর্থাৎ আলেয়া বলে। বঙ্গদেশে সন্ধ্যাকালে অনেকেই আলেয়ার আলো দেখিয়াছেন ; সাধারণ সংস্কারে উহা প্রেতিনীর কার্য্য বলিয়া প্রবাদ আছে। রাসায়নিক বিজ্ঞানের তীব্র বিশ্লেষণে প্রেতিনীর শরীরে এক ভাগ কার্ব্বন ও চারি ভাগ হাইড্রোজেন পাওয়া গিয়াছে। এই গ্যাস দুর্গন্ধময়। কলিকাতার রাস্তায় যে গ্যাসের আলো জ্বালা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে এই গ্যাস প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

এই জাতীয় অণু আবার পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নূতন নূতন অবয়ব ধারণ করে।

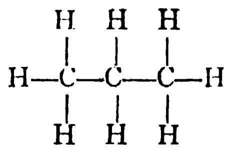
$$H-C\equiv C-H$$

উপরের লিখিত দুইটী কার্ব্বন পরমাণু দুইটী হাইড্রোজেন

পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহাকে Acetylene গ্যাস বলে। আজ কাল ঘরে কার্ব্বাইড গ্যাস জ্বালা হইয়া থাকে। প্রদীপ নিবাইলে যে ধূম নির্গত হয় তন্মধ্যে এই গ্যাস থাকায় এত দুর্গন্ধ হয়। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমরা সচরাচর যে তৈলের বা বাতির আলো জ্বালিয়া থাকি তাহার তৈল অংশ অগ্নির উত্তাপে বিশ্লিষ্ট হইয়া Acetylene গ্যাসে পরিণত হয়, পরে উত্তাপের বিশ্লেষণে তাহার জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি আমাদের নিকট জ্যোতিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কলিকাতার রাস্তায় এই Acetylene গ্যাস বহু পরিমাণে বিদ্যমান্য আছে।

অঙ্গার নিতান্ত কাল, "অঙ্গারং শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি ;" কিন্তু প্রাণীজগৎ সমস্তই এই অঙ্গারের সৃষ্টি। অঙ্গার না থাকিলে ইহার কোনটীরও অস্তিত্ব থাকিত না। উদ্ভিদ ও জীব মাত্রেরই মূল উপাদান অঙ্গার। এই অঙ্গার আবার অন্য বস্তুর সহিত না মিশিয়াও অদ্ভুত অদ্ভুত আকার ধারণ করিতে পারে। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বহু মূল্যবান্ ও সুন্দর হীরকখণ্ড বিশুদ্ধ অঙ্গার মাত্র, এবং আমরা কাগজের উপরে যে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া থাকি, সেই পেন্সিলের ধাতুর ন্যায় পদার্থটী বিশুদ্ধ অঙ্গার ; ইহাকে Graphite বলে। অঙ্গার, হীরক, ও পেন্সিলের মজ্জা একই বস্তু, ইহা ধারণার অতীত, কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। Acetylene

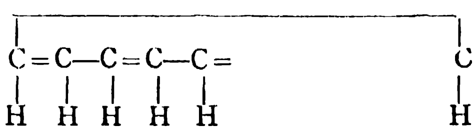
Gas' এর সহিত দুই পরমাণু হাইড্রোজেন মিলিত হইয়া Ethylene গ্যাস সৃষ্টি হয়। ঐ প্রকারে অণু ক্রমান্বয়ে যুক্ত হইয়া নূতন নূতন দুর্গন্ধময় ও জ্যোতিপ্রদ গ্যাস সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথা :—



সাধারণতঃ ইহার নাম C_nH_{2n+2} দেওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ যতটী অঙ্গার পরমাণু তাহার দ্ব্যধিক হাইড্রোজেনের পরমাণু। এই জাতীয় দ্রব্যগুলি সকলই দুর্গন্ধময় ও সকলই দাহ্য। এইক্ষণে ঘরে ঘরে যে কেরোসিন জ্বালান হইয়া থাকে, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহার উপাদান C_8 H_{18}। প্যারাফিনের বাতি বলিয়া বাজারে যে এক প্রকার বাতি পাওয়া যায়, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ডাক্তারেরা যে Vaseline ব্যবহার করেন, তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত। এই সকল বস্তুতে অগ্নি সংযোগ করা মাত্র বাতাসের অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস ও জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় এবং উত্তাপ ও আলো বিকীরণ করে। কার্ব্বন হাইড্রোজেনের সহিত অক্‌সিজেন সামান্য মাত্রায় মিলিত হইলে আবার ঘি, চর্ব্বি বসা জাতীয় বস্তু উৎপন্ন হয়; এই শ্রেণীর বস্তু দাহ্য কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর বস্তুর ন্যায় তাপ-উৎপাদক নহে; কারণ, অক্‌সিজেন কতক

পরিমাণে ইহার শরীরে বিদ্যমান থাকায় পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ন্যায় বায়ু হইতে অধিক মাত্রায় অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে না। উদ্ভিজ্জ গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে কার্ব্বনের পরমাণু সংখ্যা ৬টীর কম হইলে তাহা তরল পদার্থ রূপে স্থায়ী হয় না।

ছয়টী কার্ব্বন পরমাণুর সহিত ছয়টী হাইড্রোজেন পরমাণু গ্রথিত হইয়া যে মালা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা রাসায়নিক পণ্ডিতগণের গন্ধ-মাল্য বেঞ্জিন (Benzene)। তাহার আকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

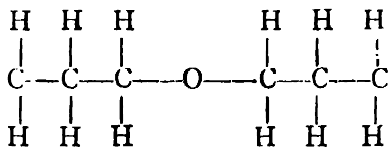


পণ্ডিত কেকুলে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ গন্ধতৈল বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার সমস্তগুলি এই গন্ধ-মালিকার রূপান্তর মাত্র। এই মালায় প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিবর্ত্তে অন্য এক মাত্রা বিশিষ্ট অণু, অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টি প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিজ্জ গন্ধ-তৈল উৎপন্ন হয়। ইহাতে মালার মূল গঠন প্রকৃতি ব্যত্যয় হয় না।

এই প্রকারে ভাওলেট, ভ্যানিলা, Winter green, দারুচিনি, মৌরি প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য রাসায়নিক উপায়ে সৃষ্ট হইয়াছে।

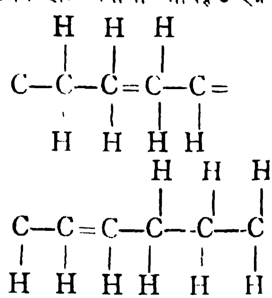
অক্সিজেনের যোজক মাত্রা ২, সুতরাং একটি অক্সিজেন পরমাণু

এই মালায় যে কোন স্থানে দুইটী কার্ব্বন পরমাণুর মধ্যে বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যথা—

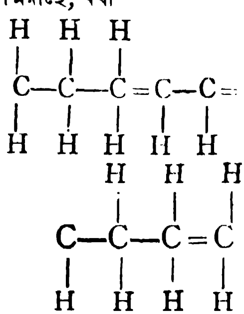


এই প্রকারে যে বস্তুটী প্রস্তুত হইল, তাহা ডাক্তারখানায় কার্ব্বলিক এসিড বা Phenol ; ইহার গন্ধ অতি তীব্র, ইহা কীটনাশক প্রধান বিষ। কাঠ হইতে প্রস্তুত করিলে Creosote (ক্রিয়োজোট) বলে। পচা দুর্গন্ধময় মূত্রের মধ্যে এক ফোঁটা কার্ব্বলিক এসিড দিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত দুর্গন্ধ দূর হয়, এবং ক্রিয়োজোটে এক খণ্ড মাংস ভিজাইয়া রাখিলে ছয় মাসেও পচে না। কার্ব্বলিক এসিডের প্রবল কীটনাশক শক্তি থাকায় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহামতি লিষ্টারের বর্ণিত পথে অস্ত্র চিকিৎসায় ক্ষতের পচন নিবারণ জন্য উহার প্রয়োগ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মানবের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছে। কেকুলের গন্ধ-মালিকার সাহায্যে গন্ধদ্রব্য অনুসন্ধানের ফলে অধিকাংশ স্বাভাবিক গন্ধ-তৈলের সৃষ্টিপ্রণালী অবগত হওয়া গিয়াছে, এবং রাসায়নিক প্রণালীতে সর্ব্বত্র তাহা বিক্রীত হইতেছে ও ঐ সকল ব্যবসায় ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচুর ধনসম্পত্তির কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। কর্পূ-

রের বৃক্ষ জাপানে জন্মে। কর্পূরের ব্যবসায় জাপানীদিগের এক-চেটিয়া থাকায় গত দশ বৎসরে কর্পূরের মূল্য তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। মহামতি কেকুলের দর্শিত পথে রাসায়নিক প্রণালীতে প্রথমতঃ তার্পিন তৈলের সৃষ্টি-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়; যথা :—



ইহাতে আবার এক পরমাণু অক্সিজেন রাসায়নিক উপায়ে সংযোগ করিয়া কর্পূর জন্মিয়াছে, যথা—



এইক্ষণ অল্পকাল মধ্যেই কর্পূরের মূল্য কমিয়া যাইবে।

নীল এতদ্দেশে জন্মে এবং নীলের ব্যবসা ইউরোপীয় বণিক্‌-গণের একচেটিয়া ছিল। মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় জর্ম্মানীতে রাসায়নিক উপায়ে নীল সৃষ্ট হয়, তদবধি নীলের চাষ ও নীলকরের দৌরাত্ম্য লোপ হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

গোলাপ, কমলাফুল, ল্যাবেণ্ডার, লেবুঘাস, জিরেনিয়াম্‌, নিরোলি প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ গন্ধ-পুষ্পের গন্ধসারও এই উপায়ে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, সেগুলির পরমাণু সমাবেশ মালার ন্যায় বৃত্তাকারে নহে, তাহা চেইনের ন্যায় এক রেখায় নিবদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত গন্ধ দ্রব্যগুলির পরমাণু-মালার ন্যায় বৃত্তাকারে সাজান এবং শেষোক্তগুলি যে চেইনের ন্যায় একরেখায় নিবদ্ধ, তাহা Polarisation of light—অর্থাৎ আলোকরশ্মির ক্রিয়ার দ্বারাও ল্যাডেনবার্গ, বেয়ার ও পার্কিন কর্তৃক পরীক্ষিত সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই প্রকারে মৃগনাভির তুল্য গন্ধবিশিষ্ট বস্তু রাসায়নিক উপায়ে সৃষ্ট হইয়াছে; তবে ঠিক মৃগনাভি এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল পরম সুগন্ধ দ্রব্যাদি নির্গন্ধ কৃষ্ণকায় অঙ্গারের বংশ-সম্ভূত। জগতে যত প্রকার সুগন্ধ পুষ্প আছে, তাহার সমুদায়ই অঙ্গারমূলক। বৃক্ষের পরিণাম পুষ্পও যে তৎসম্ভূত, ইহা মনে করিলে বিষয়টা কতক পরিমাণে বোধগম্য হয় বটে, কিন্তু বিস্ময়ের মাত্রা কমে না। রাসায়নিক উপায়ে এই সমস্ত গন্ধদ্রব্যের সৃষ্টি-প্রণালী আলোচনা করিতে গেলে আরও

বিস্মিত হইতে হয়। অঙ্গার অর্থাৎ কার্ব্বন যখন ইহাদের মূল উপাদান, তখন এই সকল গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিতে গেলে কোন্ জিনিষের প্রয়োজন, তাহা সহজেই প্রতীতি হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহরের রাস্তায় যে গ্যাসের আলো আছে, তাহার উপাদান কার্ব্বন বা অঙ্গার। এই গ্যাস পাথুরিয়া কয়লা হইতে প্রস্তুত হয়। পাথুরিয়া কয়লা বায়ুশূন্য পাত্রে পূরিয়া, অর্থাৎ ভিতরে বায়ু না থাকে এমন ভাবে ভরিয়া পোড়াইলে তাহা হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহা পরিষ্কার করিয়া লইলেই রাস্তার আলোর গ্যাস হয়। ঐ ধূম পরিষ্কৃত করিবার জন্য যে সকল পাত্রের ভিতর দিয়া পরিচালিত হয় তাহার প্রথম পাত্রে যে ময়লা নিম্নে পড়ে, তাহার নাম আল্‌কাতরা। আল্‌কাতরা অতি নিবিড় কালো, এবং অনেকেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন; কিন্তু এই আল্‌কাতরা হইতেই রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও নব নব সংযোগ দ্বারা এই সকল গন্ধদ্রব্যের সৃষ্টি হইতেছে। এই আল্‌কাতরা হইতে চিনি অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক সুমিষ্ট Saccharin প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ইহা হইতে বাসন্তী রং, কমলা রং, গোলাপ ফুলের রং, ম্যাজেণ্টর, সবুজ, নীল, ভাওলেট প্রভৃতি বহুবিধ নয়নরঞ্জন রঙের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহা প্রস্তুত করিয়া ও দেশ বিদেশে বিক্রয় করিয়া জর্ম্মানদেশবাসী জনগণ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রতি বৎসরে অন্যূন ১৮ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার রঙ রাসায়নিক উপায়ে আল্‌কাতরা হইতে সৃষ্ট ও বিক্রীত হইয়াছে।

রাসায়নিক পরীক্ষায় বা রাসায়নিক অনুসন্ধানে বহু মূল্যবান্ যন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না। বাঙ্গালীর যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, তাহাতে একাগ্রতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকিলে অতি সহজেই অধিকাংশ বাঙ্গালী রসায়ন শাস্ত্রে সুপটু এবং রাসায়নিক অনুসন্ধানে সিদ্ধ-হস্ত হইতে পারেন। বঙ্গের কৃতী সন্তান ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গবাসী আর কতকাল কেরাণীগিরি ও ধূমপানে, তাস-দাবা-পাশায় জীবন অতিবাহিত করিবে ?

গন্ধ-বিকীরণ

উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের অভ্যন্তরে যে তৈল পদার্থ থাকায় তাহার গন্ধ উপলব্ধি হয়, ঐ গন্ধতৈল সর্ব্বসময়েই অল্পাধিক পরিমাণে বায়বীয় আকার ধারণ করিতেছে ; একারণ অনেকে উদ্ভিজ্জ গন্ধ-তৈলকে বায়ী তৈল বা Volatile oil বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, আমরা যে সকল পদার্থের সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি তত্তৎ পদার্থের ঘন কণা বা Solid particle বায়ুযোগে সঞ্চালিত হইয়া নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া গন্ধ উৎপাদন করে। কিন্তু বহু পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, গন্ধ বিকীরণে Solid particle বায়ু কর্তৃক সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক নহে। গন্ধ-উৎপাদক বস্তু বাষ্প-জাতীয় অর্থাৎ বায়বীয়। ডাক্তার জন আইটকেন (John Aitken)

বহু পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যে, গন্ধ বিকীরণে ঘন কণা বায়ুর সহিত সঞ্চারিত হয় না। এতৎ সম্বন্ধে আইটকেন সাহেবের পরীক্ষা অতীব বিস্ময়কর। তাঁহার পরীক্ষা-প্রণালী বুঝিতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়টীতে প্রণিধান করা প্রয়োজন। এক গ্লাস জলে যতটা লবণ দ্রব করা যায়, তাহা দ্রব করিয়া লইলে, পরে তদপেক্ষা অতিরিক্ত লবণ দিতে গেলে সে অতিরিক্ত লবণ আর দ্রব না হইয়া গ্লাসের ভিতর জলের নিম্ন ভাগে পতিত হয়। ইহাকে Point of Saturation—অর্থাৎ পূর্ণমাত্রা বলে। এক গ্লাস জলে চিনি গুলিতে গেলেও ঐরূপ পূর্ণমাত্রায় গোলার পর অতিরিক্ত চিনি নিম্নে পড়িয়া থাকে। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় লবণাক্ত জলে কিছু পরিমাণ চিনি মিশান যাইতে পারে। তাহাতে লবণ অথবা চিনি অধঃস্থ হয় না। একটী গ্লাস জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে জল দিতে গেলে জল পড়িয়া যায়, কিন্তু চিনি অথবা লবণ অনেকটা দিলেও তাহার স্থান থাকে। ইহার কারণ কি ? একটা বাল্‌তিতে কমলালেবু সাজাইয়া পূর্ণ করিলে তাহার উপর আর একটী কমলালেবু রাখিতে গেলেই সেইটী পড়িয়া যায় ; কিন্তু, সেই কমলা-পরিপূর্ণ বাল্‌তিতে বহু পরিমাণ সর্ষপ ঢালিয়া দিলে সর্ষপের বেশ স্থান হয়, তাহা পড়িয়া যায় না। এইরূপ কমলা ও সর্ষপ দ্বারা পূর্ণ হইলে তাহাতে আর কমলা বা সর্ষপ ধরে না ; কিন্তু তাহার মধ্যে জল ঢালিয়া দিলে কতক পরিমাণ জলের স্থান হয়। বায়ুর মধ্যে বাষ্পের আবস্থান এইরূপ। বায়ুকণা পরস্পর

পরস্পরকে স্পর্শ করে না, মধ্যে যথেষ্ট অন্তরাল থাকে। তন্মধ্যে অন্য প্রকারের বাষ্পকণা প্রবিষ্ট হইবার যথেষ্ট স্থান থাকে। আবার কোন স্থান বাষ্প কর্তৃক পরিপূর্ণ হইলে, পরে যদি সেই জাতীয় বাষ্প আর দেওয়া যায়, তবে অতিরিক্ত বাষ্প তরল আকারে পরিণত হইয়া অধঃপতিত হয়। কিন্তু, বায়ু এক জাতীয় বাষ্প কর্তৃক পরিপূর্ণ—অর্থাৎ Saturated হইলেও, তাহাতে অন্য জাতীয় বাষ্পের প্রবেশাধিকারের স্থান থাকে। কিন্তু বায়ু কোন বাষ্প কর্তৃক পরিপূর্ণ—অর্থাৎ Saturated হইলে, যদি ঐ বাষ্প-পরিপূর্ণ স্থানে কোন প্রকারের কোন ঘন কণা অর্থাৎ Solid particles ধূলি রূপে সামান্য মাত্রায় প্রবেশ করান যায় তবে কতকটা বাষ্প স্থান অভাবে সংযত হইয়া তরল অবস্থায় পূর্ণভাব মেঘ বা কুজ্ঝটিকা আকার ধারণ করে এবং পাত্রস্থ বায়ুর স্বচ্ছতার হানি করে। এই ক্ষুদ্র কুজ্ঝটিকার উৎপত্তির দ্বারা পাত্র মধ্যে ঘন পদার্থের সঞ্চার অতি সূক্ষ্মরূপে প্রমাণিত হয়। অতি সামান্য মাত্রায় কোন ঘন পদার্থের ধূলি-কণা বাষ্পপূর্ণ—অর্থাৎ Vapour Saturated পাত্রে প্রবিষ্ট করাইলে এই প্রকার কুজ্ঝটিকা জন্মিয়া থাকে। ডাক্তার আইট্‌কেন্ মৃগনাভি ও অন্যান্য ২৩টী গন্ধ দ্রব্য এই প্রকার কোন বাষ্পপূর্ণ—অর্থাৎ Vapour Saturated পাত্র মধ্যে রাখিয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোন পরীক্ষাতেই পাত্রস্থ বাষ্প সামান্য কুজ্ঝটিকায়ও আবৃত হয় নাই। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ সকল গন্ধদ্রব্য যে

গন্ধ বিকীরণ করে, তাহাকে কোন ঘন পদার্থ—অর্থাৎ Solid particle নাই; কারণ, ঘন পদার্থ থাকিলে বিভিন্ন বাষ্পের কতক অংশ কুজ্ঝটিকায় পরিণত না হইয়া যাইত না। বাষ্পপূর্ণ অর্থাৎ Vapour-saturated ঘরে গন্ধ দ্রব্যের গন্ধ বিকীরণের বাধা হয় না, সুতরাং এতদ্দ্বারা সপ্রমাণিত হয় যে, গন্ধদ্রব্যের গন্ধ বাষ্পজাতীয় পদার্থ, Solid particle বা ঘন পদার্থ নহে। ডাক্তার আইট্‌কেন্ সাহেব সহরের পচা নর্দ্দমার তরল পদার্থ (Sewer) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার দুর্গন্ধে কোন ঘন পদার্থ বিকীর্ণ হয় না। বাষ্পজাতীয় পদার্থই বিকীর্ণ হইয়া থাকে।

এই সম্বন্ধে প্রোফেসর টিণ্ড্যালের নির্দ্ধারিত সত্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনুষ্যের অনেক ব্যাধি বীজাণু কর্ত্তৃক উৎপাদিত। প্রোফেসর টিণ্ড্যাল বহু পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, রোগ-বীজাণু বায়ুস্থিত ধূলিকণা সহ পরিচালিত হইয়া ক্ষতস্থানে বা মুখ-গহ্বরে বা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। ধূলি-কণা-শূন্য বায়ুতে দুর্গন্ধ বিকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু রোগ-বীজাণু বিকীর্ণ হয় না। সুতরাং দুর্গন্ধ রোগের মূল কারণ নহে। যে স্থান দুর্গন্ধ-ময়, তথায় সচরাচর ধূলিকণা সহ রোগ-বীজাণু যথেষ্ট থাকে, এই কারণেই দুর্গন্ধময় স্থান রোগবীজপূর্ণ বলিয়া ধারণা করা সঙ্গত; কিন্তু, দুর্গন্ধ বায়ু রোগ-বীজাণুর আশ্রয় নহে; রোগ-বীজাণু বায়ু-কর্ত্তৃক বিকীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় ধূলিকণা। প্রোফেসর

টিণ্ড্যাল একটী টীনের বড় বাক্‌সস্থিত বায়ু ধূলি-শূন্য করিয়া তন্মধে একপাত্রে পচা মাংস যুস্‌ ও অপর পাত্রে ঐ বাক্‌স মধ্যে পৃথকভা কৌশলে সদ্য মাংস যুস্‌ রাখিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ পচা মাংস যুসে গন্ধ বাক্‌সময় বিকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সদ্য মাংস যুস্‌ ধূলি-সম্পর্ক-রহি হওয়ার বহুকালেও পচে না। অথচ সামান্য ধূলিকণা ঐ সদ্য মাং যুসে প্রবেশ করাইলে তাহা ১২ ঘণ্টা মধ্যে পচিয়া উঠে। পচন ক্রিয়া কীটাণু-ঘটিত। পচা মাংস যুসে অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষ করিলে বহু সংখ্যক পচনকারী কীটাণু দৃষ্ট হয়। বায়ুস্থিত ধূলিকণ পরীক্ষায় কখনও পচন কীটাণু পাওয়া যায় নাই। এতদ্দ্বারা ধূলি কণায় পচন কীটাণুর বীজাণু—অর্থাৎ Spores থাকা অনুমিত হয়। বীজাণুগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তাহা ২০০০ Diameter অর্থাৎ ৮০০ কোটী গুণ বর্দ্ধনকারী অণুবীক্ষণেও দৃষ্ট হয় না।

অনেক ধাতুর বিশেষ বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন লোহার গন্ধ, তামার গন্ধ, পিতলের গন্ধ ইত্যাদি। প্রোফেসর আয়ারটন (Ayrton) সাহেব বহু পরীক্ষার পর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ ধাতুর কোন গন্ধ নাই। রাসায়নিক উপায়ে ধাতু পরিষ্কার করিলে এবং তাহা শুষ্ক বায়ুতে রাখিয়া হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিলে তাহার কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। ঘর্ম্মসিক্ত হস্তে বিভিন্ন প্রকারের ধাতু স্পর্শ করিলে তাড়িত ঘটিত ক্রিয়া রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া শরীর-নিঃসৃত কার্ব্বনিক এসিড সহিত জলীয় বাষ্পের সংমিশ্রণে যে বিভিন্ন

Hydro-Carbon অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন-ঘটিত গ্যাস্ জন্মে, তাহারই গন্ধ ঐ ধাতুর গন্ধ বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাঁহার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, যে স্থলে ধাতুর গন্ধ পাওয়া যায়, সেই স্থলেই রাসায়নিক ক্রিয়া বর্ত্তমান কিন্তু সকল রাসায়নিক ক্রিয়াতেই গন্ধের উন্মেষ হয় না। যে রাসায়নিক ক্রিয়াতে Hydro-Carbon সৃষ্ট হইয়া বিকীর্ণ হয়, তাহাতেই গন্ধের সত্তা উপলব্ধি হয়। প্রোফেসর আয়ারটন কোন ধাতু ব্যবহার না করিয়া কৃত্রিম প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর গন্ধ উৎপন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আলুমিনিয়ম Aluminium টিন ও দস্তা সংস্পর্শে যে গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা পরস্পর বিশেষ বিভিন্ন নহে; কিন্তু তাহা পিত্তল কাঁসা অথবা জর্ম্মান সিলভারের গন্ধ হইতে ভিন্ন, আবার এই সকল ধাতুর গন্ধ লৌহ বা ইস্পাত-জনিত গন্ধ হইতে ভিন্ন। ইহার কোন স্থলেই ধাতুর গন্ধ পাওয়া যায় না। যে Hydro-Carbon রাসায়নিক ক্রিয়ায় সৃষ্ট হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহার গন্ধই ধাতুর গন্ধ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। বিবিধ প্রকারের ধাতু-ঘটিত বার্ণিসে বা রঙে যে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, তাহারও উপাদান ধাতু নহে। রঙের উপাদান তার্পিন তৈল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া এলডিহাইড নামক হাইড্রোকার্ব্বন জন্মে, তাহারই এই তীব্র গন্ধ।

সার উইলিয়ম রাম্‌সে পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কোন বস্তুর গন্ধ-বিকীরণ শক্তি পাইতে হইলে তাহার অণুগুলি হাইড্রোজেন

পরমাণু অপেক্ষা অন্ততঃ ১৫ গুণ ভারি হওয়া প্রয়োজন। এমোনিয়ার অণু হাইড্রোজেন অপেক্ষা মাত্র ৮॥ গুণ ভারি। এমোনিয় গ্যাস সম্ভবতঃ কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া স্বরূপে আমাদিগের নাসারন্ধ্রে গন্ধ বোধ জন্মাইয়া থাকে।

এই সমস্ত পরীক্ষার ফল পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, নাসারন্ধ্রে ঘন পদার্থের অণু-সমষ্টির সংঘাত দ্বারা গন্ধের উৎপত্তি হয় না। বায়বীয় পদার্থ বিশেষতঃ Hydro-Carbon জাতীয় পদার্থ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে গন্ধবোধ জন্মাইয়া থাকে। কনষ্টান্টিনোপল নগরে সেণ্ট ছোফিয়ার গির্জ্জায় কতকগুলি স্তম্ভ প্রস্তুত করার সময়ে Mortar অর্থাৎ সুরকির সহিত মৃগনাভি মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বহু শত বৎসর গত হইয়াছে, অদ্যাপি সেই সকল স্তম্ভে মৃগনাভির গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে বিস্মিত হইয়া ফরাসী পণ্ডিত বার্থেলট গন্ধ বিকীরণে কি পরিমাণ অণু ক্ষয় হয়, তাহা নির্দ্ধারণ জন্য এক গ্রেণ কস্তুরী ২০ বৎসর কাল বাহিরে রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ওজন করিয়া দেখা গেল ঠিক ১ গ্রেণই আছে, ওজনে ধরা পড়িতে পারে, এমন কিছুই কমে নাই। এ বিষয়ে এখনও অনুসন্ধান আবশ্যক।

গন্ধ-গ্রহণ

গন্ধ বিকীর্ণ হইলেই যে নাসা সহজে গ্রহণ করে, এমত নহে। নাসার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতে হইলে ফুস্‌ফুস্‌ দ্বারা গন্ধ বায়ুর

স্রোতে নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করান আবশ্যক। কেবল মাত্র diffusion অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থের বিকীরণ দ্বারাই সহজে গন্ধ গ্রহণ হয় না। প্রোফেসর আয়ারটন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই বিষয়টী পরীক্ষা ও লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তীব্র-গন্ধ পদার্থও নাসিকার নিকটে ধারণ করিয়া যদি নিঃশ্বাস গ্রহণ না করা যায় তবে তাহার গন্ধ পাওয়া যায় না। মরিচ বা এমোনিয়া নাকের নিকট ধরিলেও নিঃশ্বাস না টানিলে গন্ধ পাওয়া যায় না। একটী নলের ভিতর এক-টুকুরা কর্পূর রাখিয়া যদি তাহা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তাহাতেও শ্বাস না টানিলে গন্ধ পাওয়া যায় না।

আমরা জিহ্বায় আম, লিচু, গোলাপজাম প্রভৃতির আস্বাদে যে বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহা গন্ধ-ঘটিত। অধিকাংশ খাদ্য-বস্তুর সুস্বাদুতার প্রধান উপকরণ সুগন্ধ। কণ্ঠগহ্বর দ্বারা খাদ্য-বস্তুর সৌরভ নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হওয়ার সময় যে গন্ধ উপলব্ধি হয়, তাহাতেই আস্বাদের মাধুর্য্য বোধ হইয়া থাকে। সুস্বাদু বস্তু আহার করিয়া ওষ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকি, ইহাকে ইংরাজীতে Smacking the lips বলে। এই ক্রিয়াতে মুখগহ্বরস্থ সুগন্ধি বায়ু নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সুগন্ধ দ্বারা আহারের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অনেকেই জানেন, সর্দ্দি লাগিলে অরুচি হয়। ইহার এক কারণ, গন্ধ-বোধের অভাবে বস্তুর আস্বাদ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। যাহাদিগের

নাসিকা ব্যাধিগ্রস্ত, তাহারা অনেকেই খাদ্য-বস্তুর স্বাদ পায় না বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকে। গন্ধ-বোধ না থাকিলে বিভিন্ন প্রকারের মশল্লার রন্ধনের আস্বাদের পার্থক্য বোঝা ত দূরের কথা, এমন কি, জিহ্বা দ্বারা দারুচিনি ও লবঙ্গের পার্থক্যও উপলব্ধি হয় না।

ঘ্রাণ-শক্তি আস্বাদন-শক্তি অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। ইথাইল আল্‌কহল অতি অল্প মাত্রায় থাকিলেও তাহার মিষ্ট আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু আস্বাদ পাইতে হইলে এক Gramme গ্রামে অন্ততঃ দুই molecular unit এল্‌কহল্ থাকা আবশ্যক। অথচ এক গ্রামে এক molecular unit'এর ২০০০০০ দুই লক্ষ ভাগের এক-ভাগ Elthyl alcohol থাকিলেও তাহার আঘ্রাণ পাওয়া যায়। এস্থলে ঘ্রাণশক্তি আস্বাদন-শক্তি অপেক্ষা চারিলক্ষ গুণ বেশী। হেণ্ড্রিক সাহেব বলেন যে, প্রত্যেক মনুষ্যের গন্ধ ভিন্ন, এবং কুক্কুর-গণ গন্ধ দ্বারা মনুষ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। আমাদের ঘ্রাণশক্তি শিক্ষা দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে আমরাও হয়ত কালে প্রত্যেক মনুষ্যের পৃথক গন্ধ উপলব্ধি করিতে পারগ হইব। টেরিয়ার কুক্কুর গন্ধ দ্বারা বহুদূর-গত পলাতক ব্যক্তিকে অনুসরণ করিয়া আক্রমণ করে। বর্ত্তমান সময় সভ্য দেশে সর্ব্বত্রই পলাতক হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য টেরিয়ার কুক্কুরের এই অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। A. Conandoyle রচিত "Sign of Four" নামক ডিটেকটিভ গল্পে ইহার একটী সুন্দর কল্পনার অবতারণা আছে।

প্যারিস নগরে দস্যুদিগকে ধরিবার জন্য কুকুরের প্রয়োগ বায়স্কোপে অনেকে দেখিয়াছেন। তাহাতে কতক আভাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের সুপরিচিত বঙ্গীয় পুলিস বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইনেস্পেক্টর জেনারল মিঃ হিউজ বুলার সাহেব বঙ্গদেশের ডিটেক্‌টিভ সম্প্রদায়ে টেরিয়ার কুক্কুর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ক্রিয়াতে শরীরের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইয়া শরীরের গন্ধ বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রকারে কামাতুর ব্যক্তির গন্ধ, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির গন্ধ, লুব্ধ ব্যক্তির গন্ধ, মুগ্ধ ব্যক্তির গন্ধ বা অসূয়া-পরবশ ব্যক্তির গন্ধ ভিন্ন হইতে পারে; এবং কালে নাসিকার দ্বারা না হউক, যন্ত্র বিশেষ দ্বারা সেই গন্ধ উপলব্ধি করিবার জন্য micro-olfactoscope ও micro-olfactometer সৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি থাকিলে যেমন চসমা ব্যবহার করা হয়, শ্রবণশক্তির ত্রুটিতে যেমন Ear-drum ব্যবহার করা হয়, তেমনি ঘ্রাণশক্তির ত্রুটি হইলে লোকে তখন নবাবিষ্কৃত Patent nose-tube পরিতে বাধ্য হইবে।

গন্ধ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান নিতান্ত অভিনব উদ্যম। গন্ধ সম্বন্ধীয় অনেক সত্য এইক্ষণ পর্য্যন্তও কোন পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। এখনও বহু তথ্য মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ-পত্রে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

শ্রীগণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

বিশ্ব-বিদ্যালয়

এ বিদ্যালয়ের অনন্ত শ্রেণী। প্রত্যেক শ্রেণীর আরম্ভ সূতিকা-গৃহে ও শেষ শ্মশানমঞ্চে বা সমাধি-গহ্বরে। স্বয়ং ভগবান্ এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-গুরু। এখানকার শিক্ষা-প্রণালী বিচিত্র। গুরু সকল শিষ্যের কাছে সর্ব্বদাই উপস্থিত, অথচ কেহই তাঁহার সন্ধান পায় না। শিক্ষাদানের কাজগুলি তিনি প্রায় 'মনিটার' দিয়াই সারেন। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন, সমাজ, সংসার, সকলেই এক একটী মনিটার। রোগ, শোক, সম্পদ্, বিপদ্, উন্নতি, অবনতি, নানা পথে, নানা আকারে বিচিত্র শিক্ষা হৃদয়ের উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আলোক ও বায়ুর মত আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন যে শিক্ষাটী যে পথে আসে তখন তা'কেই যে বরণ করিয়া লইতে পারে, তা'কেই যে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে পারে, সে-ই এক পা অগ্রসর হইল। নচেৎ সে কালও যেখানে ছিল, আজও সেখানেই থাকিল। সেই প্রত্যাখ্যাত শিক্ষা যতদিন তার আয়ত্ত না হইবে, ততদিন তাহারই জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইবে।

*

সুখ-সম্পদের ক্রোড়ে যাহার জন্ম, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখ

সম্পদ্‌ই যে ভোগ করিল, যে কোন দিন স্বাস্থ্যনাশ, বিত্তনাশ, বন্ধুনাশ মাননাশ প্রভৃতির কষ্ট ভোগ করে নাই, স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতির শোকে মুহ্যমান হয় নাই, যাহার পত্নী প্রিয়বাদিনী, প্রিয়কারিনী ও পতিব্রতা, যাহার পুত্র পিতৃভক্ত, পণ্ডিত ও সুস্থকায়—এক কথায় সংসারে যে ব্যক্তি পরম ভাগ্যবান বলিয়া খ্যাত, তাহার মত হত-ভাগ্য আর কে আছে ? তাহার যে এবার কোন শিক্ষাই হইল না ! এজন্মটাই যে তার বৃথা গেল। সে যে ক্লাশের বেঞ্চে বসিয়া সারাটা জীবন ঘুমাইয়াই কাটাইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে তার কপালে কিছু সুখভোগ ছিল, তাই এযাত্রায় সে শুধু ভোগই করিয়া গেল। শিক্ষালাভ আর তার কিছুই হইল না। সংসরের সুখ ভোগ করিতে করিতে সংসারের উপর তার আসক্তি ক্রমে আরও বাড়িয়া গেল। একবারের জন্যও গুরুর একটু ভৎর্সনাও সে শুনিল না। এ যাত্রায় গুরু তার কোন খবরই লইলেন না। তা'কে তিনি কোন নূতন পাঠও অভ্যাস করিতে দিলেন না। সংসারের সুখভোগ আত্মার বিকাশের অন্তরায় স্বরূপ।

বলা বাহুল্য যে, আমাদের মত সাধারণ মানুষের কথাই এখানে বলা হইল। জনকাদি মহাপুরুষের কথা বলিতেছি না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনুষ্য-বিভাগের যে শিক্ষা, তাহা তাঁহাদের প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা বহুপূর্ব্বেই তাঁহাদের হইয়া গিয়াছে। সংসারিক কোন বিষয়েই তাঁহাদের আসক্তি নাই।

তাঁহাদের পক্ষে রাজা হওয়া, ফকির হওয়া,—দুই-ই সমান। তাঁহারা "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষুবিগতস্পৃহঃ।"

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিভাগ। স্বয়ং প্রকৃতি দেবী গুণানুসারে সকলকে উপযুক্ত বিভাগে, উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তমোগুণাত্মক স্থাবর, ক্রমে জঙ্গমে উন্নীত হয়। জীবাত্মা তমোগুণাত্মক Protyle রূপ আবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে রজোগুণের ভিতর দিয়া শুদ্ধ সত্বগুণে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রস্তর উদ্ভিদ্ হয়, উদ্ভিদ্ জন্তু হয়। রজোগুণের ক্রম-বিকাশ অনুসারে সাগরফেনা (Jelly fish) ক্রমে মৎস্য হয়, মৎস্য সরীসৃপ হয়, সরীসৃপ পক্ষী হয়, পক্ষী পশু হয়, পশু মানুষ হয়। মানুষ ক্রমে সত্ব-রজের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে। যুগের পর যুগ চলিয়া যায়, ক্রমে জীবাত্মা রজোগুণের উপরের ধাপে উঠে। ক্রমে রজোগুণ ছাড়িয়া শুদ্ধ সত্ব গুণের বিভাগে প্রমোশন পায়,—ক্রমে মানুষ দেবতা হয়। দেবতা যে কি হয়, মানুষের ভাষায় তাহা প্রকাশের উপযোগী শব্দ নাই, কারণ মানুষ তাহা জানে না। এইমাত্র বলা যায় যে, ছোট দেবতা ক্রমে বড় দেবতা হয়। সামান্য দেবতা ক্রমে লোকপাল হয়, লোকপাল প্রজাপতি হয়। খাল ক্রমে নদী হয়, ছোট নদী বড় নদী হয়, বড় নদী গিয়া সাগরে মেশে। মানুষই বিধাতার চরম সৃষ্টি তাহা মনে করিবার কোন কারণই নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনুষ্য-বিভাগের শিক্ষা যখন শেষ হয়,

মনুষ্যের জড়দেহ ধারণ করিয়া জীবাত্মা যখন যতদূর সম্ভব বিকাশিত হইয়া উঠে তখন আরও বিকাশের জন্য তাহার আর জড় দেহ ধারণের জন্য প্রয়োজন হয় না। তখন তার দেব-দেহের প্রয়োজন। সে পায়ও তাই। ইহা অনুমান করা কিছুতেই অসঙ্গত নহে। আমরা যাহা চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পাই না, বিশ্বে যে তা নাই, সে কথা কে বলিল? চর্ম্ম চক্ষে ত অনেক পদার্থই অদৃশ্য। অনেক স্থূল জড় পদার্থও ত জড়চক্ষে দেখিতে পাই না, নিজের মাথাটাও কোন দিন দেখি নাই, অথবা দেখিবার কোন সম্ভাবনাও নাই। দর্পণে যেটা দেখি, সেটাত মাথার প্রতিবিম্ব, আসল মাথা নয়। আসল মাথা দেখিতে পারি না বলিয়া কি মাথা নাই? জড় পদার্থের সকল গুলিই যখন জড় চক্ষের বিষয়ীভূত হয় না তখন অজড় সৃষ্টি যে কিরূপ পদার্থ, জড় চক্ষু তার কি পরিচয় দিবে? চক্ষে দেখি না বলিয়া কি দেবতা নাই? যদি বিশ্বের একজন অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত শক্তিশালী মালিক থাকেন, তিনি কি মানুষ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়াই অক্ষমতা বশতঃ আরও উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি করিতে বিরত রহিয়াছেন? এই কাম-ক্রোধ-লোভের দাস মানুষ, এই হাসি-কান্নার ক্রীড়াপুত্তলি মানুষ, এই অক্ষম দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মানুষকীটই কি বিধাতার চরম সৃষ্টি? যাহারা একথা বলে, তাহাদের বড়ই দুঃসাহস।

সম্প্রতি আর সব ছাড়িয়া দিয়া শুধু এ বিদ্যালয়ের মানুষ-বিভা-

গের শিক্ষাটাই একটুআলোচনা করিয়া দেখা যাউক। নিম্নস্তরের মানুষ, যাহাদের আধ্যাত্মিকতা অতি কম, তাহারা অনেক বিষয়েই পশুর মত। তাহাদের সুখ-দুঃখও পশুর মত। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট এবং তাহার তৃপ্তিতে যে সুখ, তাহা পশু যেমন তীব্র ভাবে অনুভব করে, মানুষ সাধারণতঃ তেমন করে না। গরু ছাগল ইত্যাদি দিন রাতই খায়। অতি মনোযোগ সহকারে নিমীলিতনেত্রে যখন তাহারা ভক্ষ্যদ্রব্য চর্ব্বন করে, তখন মনে হয় যে, ঘাস খাইয়া উহাদের যে আনন্দ হইতেছে, সুধা পান করিয়া ইন্দ্রেরও বোধ হয় তত আনন্দ হয় না। অল্পবিকশিত মানুষও শারীরিক ব্যাপারের সুখদুঃখগুলি কতক পরিমাণে সেইরূপ তীব্রভাবে অনুভব করিয়া থাকে। ত্যাগের ভাব তাহাদের মধ্যে মোটেই ফোটে নাই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ কিছুই তাহারা সহ্য করিতে পারে না। মানুষ ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য যে নিজের স্ত্রী-পুত্রের মাংস খাইয়াছে, তাহার উল্লেখ আছে। আর একটু উপরে উঠিলে স্ত্রীপুত্রের মাংস ভোজন করে না বটে, কিন্তু আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের মুখের গ্রাস খাইয়া ফেলিতে পারে। তাহারা পশুর মত স্বার্থপর, পশুর মত প্রতিহিংসাররায়ণ, পশুর মত অদূর-দর্শী। এই পশু-প্রকৃতি মানুষই প্রতি জন্মে কিছু কিছু করিয়া শিখিয়া তিল তিল করিয়া বিকশিত হয়। যে এক দণ্ড ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতে পারিত না সে অনায়াসে মাসের মধ্যে ১০।১২ দিন

উপবাস করে। যে স্ত্রীপুত্রের ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া খাইয়াছে, সে নিজের ক্ষুধার অন্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত ভিক্ষুকের মুখে তুলিয়া দিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে; যখন দারুণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ তখন Sir Philip Sydney'র মত অধরলগ্ন জলপাত্র অনাস্বাদিত অবস্থায় অপর নিঃসম্পর্কিত পিপাসা-কাতর হতভাগ্যকে দান করে, এবং তাহার পিপাসাশান্তি দেখিয়া সুখী হয়। যে ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল সে ক্ষমার অবতার হয়। ঘাতকের অসি যখন তাহার মস্তকের উপরে, তখনও যিশুর মত নিজের ঘাতকদিগের জন্য প্রার্থনা করে। পাশব প্রকৃতি দেবপ্রকৃতিতে উন্নত হইতে কত যুগ মহাযুগ যে অতিবাহিত হয়, কে তার হিসাব করিবে?

যে কৌশলে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা অতি চমৎকার। স্বার্থপর আত্ম-সুখ-পরায়ণ মানুষ যখন প্রথম যৌবনে গৃহস্থা-শ্রমে প্রবেশ করিল তখন দেখে যে সংসারের প্রতি কার্য্যেই তার স্বার্থের অন্তরায় কিছু না কিছু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। যে অর্থ সে উপার্জ্জন করে, নানা লোকে নানা দিক হইতে তার অংশ নিতে হাত বাড়ায়। অক্ষম ভাই আসে; বিধবা ভগ্নী আসে, কত মাসী, পিসী সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হন। গুরু আসেন, পুরোহিত আসেন, কত আত্মীয়, কুটুম্ব কত দিক্ হইতে তার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে ভাগ বসাইতে চান। ইহাতে প্রথম প্রথম তার কষ্ট হয়, ক্রমে কষ্টবোধ লঘু হইয়া আসে, কিন্তু তখনও ভাগ দিতে আনন্দ বোধ হয় না। জন্মের

পর জন্ম যায়, ক্রমে সে নিরানন্দের ভাবও দূরে যায়। তখন মনে হয় যে দিয়াই সুখ। পরের জন্য দেহ পাত করিয়া খাটিয়াই সুখ। এই রূপে ক্রমে ত্যাগের ধর্ম্ম শিক্ষা হয়। যতদিন তা না হইবে, ঐ একটী শিক্ষার জন্যই বারম্বার দেহ ধারণ করিতে হইবে। সুখের মধ্য দিয়া, দুঃখের মধ্য দিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়।

মাতার কাছে শিশু যে কত আনন্দের জিনিষ, তা মা না হলে কেহবোঝে না। কিন্তু শিশুর মত স্বার্থপর আর কে আছে? এ দিকে রুগ্না মাতা শারীরিক যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া রাত দুপুরে বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, ওদিকে শিশুর বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে, তার মাথার বালিশ সরিয়া গিয়াছে, শিশু সিংহনাদে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। মার যে এত যন্ত্রনা, তাহাতে শিশুর কি? তুই মরিতে হয় মর্, আগে আমার বিছানা বদলাইয়া দে, মাথার বালিশ ঠিক্ করিয়া দে, আমাকে স্তন্য পান করা, আমাকে ঘুম পাড়া, তারপর মরিতে হয় মর্ গিয়া। জননীর কি কঠোর শিক্ষক! এরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিটার। কোন্ পাঠশালার শিক্ষক ছাত্রের উপর এত কঠোর ব্যবহার করে? যতদিন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সুখের বাসনা দূর না হয় ততদিন এই সব মনিটারের হাতে পড়িতেই হইবে। শ্রুত লিপির একটা বানান একবার ভুল করিলে কথাটা বহুবার লিখিতে হইবে।

এক মহিলার কথা জানি, তিনি প্রথম প্রথম বয়সে বেশভূষায়

অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। সেই দারুণ বিপদে যুবতীর স্বভাব আমূল পরিবর্ত্তিত হইল। শোকের প্রথম তীব্র আক্রমণ হইতে যখন তিনি একবার গা-ঝাড়া দিয়া উঠিলেন, তখন কোথায় গেল তাঁর বেশ, আর কোথায় গেল তার কেশ। যিনিকাপড় ময়লা হবার ভয়ে রোগীর কাছে যাইতেন না তিনি দেশ শুদ্ধ সকল রোগীর শুশ্রূষাকারিণী হইলেন। যেখানে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগগ্রস্তকে ফেলিয়া আত্মীয়স্বজন পালায়, ডাক্তার যাহাকে ছুঁইতে সাহস করেন না, সেখানে তিনি চব্বিশ ঘণ্টা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ময়লা পরিষ্কার করিতেছেন, পূঁয ঘাটীতেছেন, রেগীকে ঔষধ-পথ্য দিতেছেন। লোকে তাঁহাকে দেবীর মত ভক্তি করে। বিষ্ঠা-চন্দনে তাঁর সমান জ্ঞান হইয়াছে। তিনি স্বয়ং নিঃসন্তান, কিন্তু জগতের নরনারী তাঁহার পুত্রকন্যা। তিনি আগে ছিলেন আর দশজনের মত সাধারণ মানুষ, কিন্তু একটা আকস্মিক বিপদের মধ্য দিয়া বিশ্বগুরু তাঁহাকে এমনি শিক্ষা পাঠাইয়া দিলেন যে, এক জন্মেই মানবী দেবী হইয়া গেল। কলেরায় তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। এখন তিনি স্বহস্তে শুশ্রূষা করিয়া, স্বহস্তে ঔষধ দিয়া কত কলেরা রেগীর প্রাণরক্ষা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন্ স্কুলে এমন শিক্ষা হয়, যাহাতে মানুষ বদ্‌লে যায়?

আমি একবার এক মুন্সেফ কোর্টের উকীলের বাসায় কিছুদিন অতিথি ছিলাম। তিনি খুব বড় উকীল, অনেকগুলি মুহুরি এবং

অগণিত মক্কেল। প্রভাতে যখন কাক ডাকিত, তখন মক্কেল আসিতে আরম্ভ করিত, আর তিনি যখন কাছারিতে যাইতেন তখনও কতকগুলি মক্কেল তাঁর পশ্চাদ্ধাবিত হইত। বহু মক্কেলের কাছে একই জাতীয় কথা যে তিনি দিবারাত্র কত শুনিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সকল মক্কেলই তার নিজের মকদ্দমাটা ভাল করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিত। উকীলবাবু সকলের কথাই মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন, এবং সকলের সঙ্গেই মিষ্টমুখে কথা বলিতেন। আমি ২।৩ দিন এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইলাম। একদিন বলিলাম—"মহাশয়, ধন্য আপনার সহিষ্ণুতা। অন্য কেহ হইলে পাগল হইত"। তিনি বলিলেন, "আমি যখন নূতন উকীল হই, তখন সহিষ্ণুতা বলিয়া একটা পদার্থ যে আমার আছে, তাহাই আমি জানিতাম না। তারপর যখন দেখিলাম যে, আমার ধমক শুনিয়া ও ভ্রূকুটি দর্শন করিয়া মক্কেল অন্যত্র চলিয়া যায় তখন রোগীর পাঁচন গেলার মত উহাদের নানা জাতীয় অসম্বদ্ধ কথা শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে নিজেই বুঝিলাম যে, আমার ত অনেক মক্কেল, এক জনের এত প্রলাপ আমার কাছে ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু উহার ত সর্ব্বস্ব লইয়া টানাটানি। এইরূপে মক্কেলের প্রতি আমার একটু সহানুভূতি হইল। এখন আর উহাদের অত্যাচারে আমার কষ্ট হয় না। আপনি বা কি দেখিলেন, উহারা আমাকে শারীরিক ক্রিয়াগুলি পর্য্যন্ত যথা-সময়ে করিতে দেয় না। পায়খানার রাস্তায় পর্য্যন্ত আক্রমণ করে।

তারপর আবার সকল হাকিমও সদ্ব্যবহার করেন না। অনেক সময় অসহিষ্ণু হাকিমদের শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া রাগে অঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। কিন্তু এখন আমি পাথর হইয়াছি। তার উপর আবার ঘরেও আমার পত্নীরূপী এক হাকিম আছেন! তিনি বিলক্ষণ কলহ-প্রিয়া এবং মিতব্যয়িতা শব্দটা তার অভিধানে নাই। সুতরাং আমার ঘরেও শান্তি নাই, বাহিরেও শান্তি নাই। ওকালতি করিয়া বহু টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি বটে, কিন্তু সঞ্চয় কিছুই করিতে পারি নাই। সঞ্চয়ের মধ্যে কেবল একটু সহিষ্ণুতা, যাহা আমার প্রথম বয়সে মোটেই ছিলনা। গাধাও অত সহিতে পারে না, আমি যত পারি"। বহুদিন পরে আজ সেই বসুন্ধরার মত ধৈর্য্যশীল উকীল বাবুর কথা মনে হইল। আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে "সঞ্চয়ের মধ্যে কেবল একটু সহিষ্ণুতা"। কিন্তু এটা কি বড় কম সঞ্চয়? তার এক মনিটার মক্কেলবর্গ, আর এক মনিটার অপব্যয়ী মুখরা ভার্য্যা। তাহাদের তীব্র শাসনে যে তিনি নূতন মানুষ হইয়াছেন, দেবত্বের দিকে এক পা অগ্রসর হইয়াছেন। কে বলে তাঁহার সঞ্চয় হয় নাই? তাঁহার যাহা সঞ্চয়, লক্ষ পতিরও ত তাহা নাই।

এই সব গৃহস্থাশ্রমের শিক্ষা। নানা জাতীয় শিক্ষা যে কত অসংখ্য পথে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই আত্ম-জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কত ঘটনায় দর্পীর দর্প চূর্ণ হয়; উদ্ধত ব্যক্তি বিনীত হয়। ছলনা, কপটতা

মিথ্যা কথা বলা যাহার অভ্যাস, তাহার মিথ্যাচার বারম্বার বন্ধু সমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রথমত সে অধিক সতর্ক হয়; তারপর ছলনা, কপটতা, মিথ্যাচার সে একেবারেই ত্যাগ করে। সহস্র ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িয়া যে শিক্ষালাভ না হয়, সংসারী মানুষ বারম্বার আঘাত পাইয়া তদপেক্ষা অধিক স্থায়ী শিক্ষা লাভ করে। যতদিন এই মোটা শিক্ষা গুলি না হয়, ততদিন গৃহস্থাশ্রম হইতে পালাইবার উপায় নাই। যাহারা জোর করিয়া পলায়ন করে, তাহারা সন্ন্যাসী সাজিয়া ও ভিক্ষা করিতে লোকালয়ে আসে। মনের ভিতর প্রবল বাসনা-বহ্নি রহিয়া গিয়াছে, তা ত নির্ব্বাপিত হয় নাই। যাহারা এরূপ ভাবে জোর করিয়া সন্ন্যাসী সাজে, গীতা তাহাদিগকে মিথ্যাচার বলিয়াছেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে"।

—গীতা, ৩।৬।

সে ত তখনও বর্ণপরিচয়ের শ্রেণীতে আছে। তাকে জোর করিয়া বি এ ক্লাশে বসাইয়া দিলে সে পারিবে কেন? যখন সময় আসিবে, তখন বি-এ ক্লাস কেন, তারও উপরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু অসময়ে এ দুশ্চেষ্টা কেন? কত জন্মই ত পড়িয়া রহিয়াছে। বৃথা ভণ্ডতপস্বী সাজিয়া একটা জন্ম অপব্যয় করিয়া লাভ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে গুরু যে পাঠ দেন,

তাহাই ভালরূপ অভ্যাস কর, তিল তিল করিয়া অগ্রসর হও। যখন সময় আসিবে তখন গুরুই বলিয়া দিবেন যে, তোমার মনুষ্য বিভাগের উপাধি-পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। ত্যাগ শিক্ষা বড় কঠিন। একটা গৈরিক পড়িয়া সংসার-ত্যাগের ভাণ করিলেই ত্যাগ হয় না। ত্যাগে যখন আনন্দ বোধ হইবে, তখনই বুঝিবে যে ত্যাগ শিক্ষা হইতেছে, তাহার পূর্ব্বে নয়। যখন দেখিবে যে, পরের জন্য দেহ পাত করিতে সুখ হয়, উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরের ক্লেশ দূর হইলে সুখ হয়, জগতের সেবা করিয়া জীবন পাত করিতে সুখ হয় তখনি তোমার সংসার ত্যাগে অধিকার হইবে, ইহার পূর্ব্বে নয়। যদি এ সব শিক্ষা লাভ না করিয়াই সংসার ছাড়ার অয়োজন কর, তবে তুমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পলাতক ছাত্র। গুরুর বেত্রাঘাতে তারপর তুমি চখের জলে পথ দেখিবে না। তুমি সংসার বান্ধিয়াছ, শিশুপুত্র, সাধ্বী স্ত্রী তোমার মুখের দিকে উদরান্নের জন্য চাহিয়া আছে, তুমি তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিলে না, তোমার যে দু'চারটা টাকা পয়সা আছে, তাহা নানারূপে দান করিয়া তুমি সংসার-পিপাসা বুকে করিয়া, সংসার ত্যাগ করিলে। হয়ত এই সংসার-তৃষ্ণাই পুনরায় তোমাকে সংসারে টানিয়া আনিবে। হয়ত তোমার দানের পুণ্যফলে তুমি বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হইবে, কিন্তু যে পত্নী-পুত্র অন্নের জন্য তোমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, যাহা-

দিগের কাতর দৃষ্টি একদিন তুমি উপেক্ষা করিয়াছিলে, তাহারাই আবার আসিয়া তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে। তোমার প্রবল বসনা ও বুকভরা ভালবাসা সত্ত্বেও তুমি তাহাদের মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিতে পারিবে না। অগাধ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে শায়িত হইয়া হয়ত একমাত্র শিশুপুত্র তোমার বুক ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবে। সাধ্বী প্রণয়িণী ভার্য্যা তোমাকে তোমার ঐশ্বর্য্যের মরুতে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবে। তুমি একবার তাহার সংসার শ্মশান করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, এবার তোমার কৈলাসপর্ব্বতসন্নিভ সুদর্শন, বিচিত্র গৃহসজ্জায় বিভূষিত, মনোহর উপবন-বেষ্টিত, সুরম্য অট্টালিকা শ্মশান করিয়া সে চলিয়া যাইবে। তোমার গৃহ-সজ্জার প্রত্যেকটী উপকরণ, উদ্যানের প্রত্যেকটি পাতা তোমার পত্নীর স্মৃতিতে জড়িত হইয়া তোমাকে প্রতি-মুহূর্ত্তে উপহাস করিবে, এবং বলিবে—"ওহে কপট সন্ন্যাসী, এতখানি আসক্তি লইয়াই না তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলে?" শান্তির জন্য তুমি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইবে, কিন্তু শান্তি মিলিবে না। ইচ্ছা থাকিলেও তুমি সংসার ছাড়িতে পারিবে না। হয়ত বৃদ্ধা মাতা বাঁচিয়া আছেন; হয়ত তোমার পত্নী একটী শিশু বালিকা রাখিয়া গিয়াছেন,—মুখখানা ঠিক তাঁরই মত দেখতে, তাকে শিক্ষা দিতে হবে, তার বিবাহ দিতে

হবে। পৃথিবীর কোন্ স্কুলের গুরু এত শাস্তির কৌশল জানে? স্বর্ণকার যেমন অগ্নিতে গালাইয়া স্বর্ণকে শ্যামিকা-মুক্ত করে, বিশ্ব-গুরুও মানুষকে তেমনি সংসারের অগ্নিতে ফেলিয়া তাহাকে সর্ব্ব-দোষ-বিনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ কাঞ্চনে পরিণত করেন। পশুবৎ মানুষ বহুজন্মের ভিতর দিয়া ক্রমে ঋষিত্বে উপনীত হয়। সে যদি লোহাও থাকে, তবু সে সোণা হয়। তাহাকে যে পরশ পাথরে ছুঁইয়াছে! হে বিশ্বগুরু, ধন্য তোমার বিদ্যালয়, ধন্য তোমার শিক্ষা-প্রণালী! কি অভাবনীয় কৌশলেই তুমি পশু হইতে দেবতা গড়!

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কতখানি অগ্রসর হইল, তাহা বুঝিবার একটা সাধারণ মাপকাঠি আছে। যাহার পার্থিব বিষয়ে আসক্তি যত কম, যে যত বেশী প্রলোভন নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিতে পারে, সে ততদূর অগ্রসর। সংসারীর পথে নানাজাতীয় প্রলোভন নানা আকারে সর্ব্বদাই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। কামের প্রলোভন, ক্রোধের প্রলোভন, লোভ মোহাদির প্রলোতন, যশের প্রলোভন অসংখ্যরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। যত বড় প্রলোভনে যে যত অবিকৃত থাকে সে তত উন্নত। পাঁচটাকার প্রলোভনে কত লোক নরহত্যা করে, আবার বুদ্ধাদির মত মহাত্মারা একটা রাজত্বকেও তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। সাধারণ লোক যেখানে সেখানে কত

ব্যভিচার করিয়া বেড়ায়, আবার স্বয়ং উর্ব্বশী আসিয়াও অর্জ্জুনকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই। যখন মানুষ এই পার্থিব প্রলোভনের উপরে উঠিয়া যাইবে, যখন তার শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত হইবে তখনি সে মুক্তির পথে পদার্পণের অধিকারী হইবে, ইহার পূর্ব্বে নয়। যাঁহারা মুক্ত, তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব-বিভাগের গ্রাজুয়েট। মুক্তের আবার অবস্থা ভেদ আছে। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সকল মুক্তই সমান। ধারাপাত বা বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত যাহার বিদ্যা, তাহার কাছে পাস কোর্স বি-এ-ও যা, কেম্ব্রিজের Senior wrangler'ও তাই।

আমরা এতক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষ বিভাগ লাইয়াই কিছু আলোচনা করিলাম। এখন তার উপরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিভাগ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সে বিভাগটাও ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্তর্গত; তবে, ছোট আর বড় এই মাত্র প্রভেদ—যেমন স্কুল ও কলেজ। এখন যে বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, তাহা অনেকটা অনুমানের রাজ্যে, সুতরাং এ সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। আমি এ বিষয়ে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষই যে বিধাতার চরম সৃষ্টি তা' মনে করিবার কোন কারণই নাই। মানুষের উপরেও যে উন্নততর

সত্তার অস্তিত্ব আছে, তাহাই বেশী সম্ভবপর। জড়জগতের সৃষ্টি বিকাশের ব্যাপার যাঁহারা একটু তলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পাথর গাছ হয়, গাছ মাছ হয়, মাছ সাপ হয়, সাপ কুমীর হয়, কুমীর পক্ষী হয়, পক্ষী পশু হয়, পশু মানুষ হয়। প্রাচীনদের মত ও নব্যপণ্ডিতদের মত এবিষয়ে এক। তাই যদি হইল, তবে মানুষের দেবতা হইতে বাধা কি? Huxley তাঁহার 'Essays upon some Controverted Questios' নামক গ্রন্থে বলেন—

"Without stepping beyond the analogy of that which is known, it is easy to people the cosmos with entities in ascending scale until we reach something practically indistinguishable from omni potence, omnipresence and omniscience."

অর্থাৎ সৃষ্টির যতটুকু অংশ আমাদের প্রত্যক্ষের রাজ্যে আছে, তাহা হইতে আমরা অতি সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, সৃষ্টির বিকাশ ক্রমশঃই উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে এমন লোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সেখানকার অধিবাসিগণ প্রায় সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। Bulwar Lytton তাঁহার Zanoni নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে সৃষ্টির বিশালতা এবং তদ্বিষয়ে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার এক জ্বলন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রত্যেকটী গ্রহ নক্ষত্র জীবে পরিপূর্ণ, এক একটী বৃক্ষপত্র কোটী কোটী জীবের

আবাস ভূমি, প্রতি জীবদেহে কোটী কোটী জীবের বাস। যিনি জলবিন্দুর মধ্যে কোটী জীবের বসতির স্থান করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার রাজ্যে একটী পরমাণুরও অপব্যয় নাই, তিনি কি এত বড় বায়ুমণ্ডল, এতবড় অন্তরীক্ষটাকে জীবশূন্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন? হৃদয়স্পর্শী ওজস্বিনী ভাষায় এই চিত্র আঁকিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"The microscope shows you the creatures on the leaf ; no mechanical tube is yet invented to discover the nobler and more gifted things that hover in the illimitable air, yet between these last and man is a mysterious and terrible affinity. And hence, by tales and legends, not wholly false nor wholly true, have arisen fron time to time, beliefs in apparitions and spectres. If more common to the earlier and simpler tribes than to the man of your duller age, it is but that, with the first, the senses are more keen and quick. And as the savage can see or scent miles away, the traces of a foe invisible to the gross sense of the civilised animal, so the barrier itself between him and the creatures of the airy world is less thickened and obscured."

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই বোধ হয়

ইংরাজি জানেন, সুতরাং অনুবাদ অনাবশ্যক। যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের জন্য ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, Bulwar Lytton ইহা খুবই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের চতুর্দ্দিকে যে বায়ু-সমুদ্র আছে, তাহা বহু উন্নত ও বুদ্ধিমান্ জীবের আবাস-ভূমি। মানুষের সঙ্গে তাহাদের আশ্চর্য্য গূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নানা আকারে তাহাদের গল্প প্রচলিত আছে। সে গুলি সকলও সত্য নয়, সকলও মিথ্যা নয়, ইত্যাদি। এদেশে যাহাদিগকে দেবযোনি বলে, এ তাহাদেরই কথা।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই লোকে বহুদেব দেবীতে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ, মিশ্রদেশ, আসীরিয়া, বাবিলন, পারস্য প্রাচীন গ্রীস ও ইতালি, প্রাচীন ইউরোপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের ত কথাই নাই, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জাতিও দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। আদিম জাতি অবধি সুসভ্য ইয়ুরোপ ও আমেরিকাবাসী সকলেই যেমন মানুষ, এবং সেই মানুষই যেমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, সেইরূপ, দেবরাজ্যেও বহু শ্রেণী-বিভাগ আছে। সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর দেবযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই দেব পর্য্যায়ভুক্ত। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাদিগকে মোটা-মুটি দুই বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—দেবযোনি ও দেব। মানুষ, পশু, পক্ষী, যেমন ভূলোকের অধিবাসী, দেবযোনিগণ

সেইরূপ ভুবর্লোকের অধিবাসী। ইহারা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্‌সরা, পিশাচ, গুহ্যক এবং বিদ্যাধর, এই আট ভাগে বিভক্ত। মধ্যযুগের ইউরোপে ইহারা Salamander, Nymph Sylph Gnome, Fairy, Satyr, Nereid, ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। মুসলমান গ্রন্থে ইহাদিগকেই জিন এবং পরি বলে। ভুবর্লোক অর্থাৎ কামলোকের অধিবাসী বলিয়া বৌদ্ধগণ ইহা - দিগকে কামদেব বলেন। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর দেবতা, তাঁহারাই প্রকৃত দেব শব্দবাচ্য। ইহাঁরা স্বর্মহ-জনতপ-সত্য প্রভৃতি উচ্চ-তর লোক সমূহে বাস করেন। দেবগণ প্রধানতঃ আদিত্য, বসু ও রুদ্র, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি, এই লইয়া দেবতার সংখ্যা ৩৩। দেবতাদের শ্রেণী বিভাগের সুবিধার জন্যই এই সংখ্যা। বাস্তবিক দেবতার সংখ্যা বহু। তেত্রিশ কোটী বলিলে কিছুই বেশী বলা হইল না। বৌদ্ধগণ দেবতাদিগকে রূপদেব ও অরূপ-দেব, এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন। ইহুদি এবং খ্রীষ্টানগণ দেবতাদিগকে angel এবং archangel বলেন। মুসলমানগণ ইহাদিগকে ফিরিশ্‌তা বলেন। পারসীকগণ ইহা-দিগকে আমেশাস্পেন্দ বলেন। দেবগণ সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য্যে নানারূপে ঈশ্বরের সহায়তা করেন। লোকপালগণ অতি উচ্চ শ্রেণীর দেবতা। ইহাঁরা ভূর্ভুবাদি সপ্ত লোকের কর্ত্তা।

খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরের সিংহাসনপ্রান্তে যে সপ্তদেবতার কথা বলেন— The seven spirits before the throne of god— ইহাঁরাই হিন্দুর লোকপাল। প্রাচীন কালডিয়ান ও সীরিয়ান-দিগের মতেও দেবতাদিগের নানা বিভাগ, যথা angels, arch-angels, principalities, virtues, dominions এবং thrones, ইঁহারা পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণের অধিপতি। এতদ্ব্যতীত cherub এবং seraph নামক আরও দুই শ্রেণীর দেবতা আছেন, তাঁহারা নক্ষত্রগণের অধিপতি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে দেবগণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তির অজ্ঞতা যত বেশী, তার দাম্ভিকতাও তত বেশী। আমরা মনে করি যে আমাদের মত বুদ্ধিমান্, আমাদের মত পণ্ডিত, আমাদের মত সভ্য মানব পৃথিবীতে আর কখনও জন্মে নাই। আমরা ঋষিদের অপেক্ষা বেশী বুঝি, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, পিথাগোরস, প্লেটো প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণ অপেক্ষা অনেক্ বড় পণ্ডিত, সুতরাং আমরা যাহা সিদ্ধান্ত করিব; তাহা ধ্রুব সত্য। সৃষ্টির যে অংশ আমাদের কাছে অপ্রত্যক্ষ, তাহা যেন সকলেরই কাছে অপ্রত্যক্ষ থাকিবে। সুতরাং যাহা আমরা দেখি না, সেরূপ কোন কথা যদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে থাকে, তবে হয় তাহা মিথ্যা অথবা তাহার একটা চলনসই রূপ রূপক ব্যাখ্যা

থাকিবে। যোগ বলে আমাদের প্রত্যক্ষের রাজ্য যে কতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণায়ই আসে না। নিজেরা যোগ অভ্যাসের চেষ্টাও করিব না, অথচ যোগ শাস্ত্রের সমালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিব যে, ও ব্যাপারটা আগাগোড়াই বুজরুকি। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাতঞ্জল দর্শনের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন "Thus the fine philosophy of Kapil was dragged through the mire."

আমারা অনেক গাঁজাখোর ভণ্ড যোগী যেখানে সেখানে দেখিতে পাই, সুতরাং সিদ্ধান্ত করি যে, যোগাভ্যাসে ঐরূপ জন্তু ভিন্ন অপর কিছুই তৈয়ারি হয় না। আমরা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করিনা যে, যখন ভণ্ড আছে, তখন কোন না কোন স্থলে আসলও থাকিবার সম্ভাবনা। আসল টাকা আছে বলিয়াই মেকি টাকা হয়। যোগবলে যাহাদের ভুবর্লোক স্বর্লোক প্রভৃতি উচ্চতর লোকে দৃষ্টিশক্তি খুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে কোন কোন অবস্থায় দেবদর্শন একবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। পণ্ডিত Max Muller বলেন যে, "Mythology is the disease of language" and "the Vedas the babblings of a child humanity"—অর্থাৎ পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি ভাষার বিকার এবং বেদ সকল মানব সমাজের শৈশব অবস্থার অস্ফুট ধ্বনি। তিনি ইহাও বলেন যে, বৈদিক

বর্ণনাগুলি প্রাকৃতিক পদার্থগুলির রূপক, অর্থৎ সূর্য্য চন্দ্র উষা, আকাশ মেঘ প্রভৃতির রূপকাকারে বর্ণনা। বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত-দিগেরই এইরূপ বিশ্বাস। এ দিকে এদেশীয় পণ্ডিতগণ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দেবগণ জ্যোতির্ম্ময় দেহধারী। দ্যুতিমান্ দেহধারী বলিয়াই তাঁহাদের নাম দেব। দেবগণ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য ঈশ্বরের নিয়োগ অনুসারে সৃষ্টির নানা বিভা-গের উপরে কর্তৃত্ব করেন। যিনি যহার উপর কর্তৃত্ব করেন তিনি তাহার অধিষ্ঠাত্রী বা অভিমানিনী দেবতা। তাঁহাদের আবার জ্যোতির্ম্ময় দেহও আছে। ইন্দ্রের দেহের কথা ব্রহ্ম-সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য একস্থলে বলিয়াছেন। ["ইন্দ্র নামা কশ্চিৎ বিগ্রহবান্ দেবঃ„—১।২।২৯] দেবগণ যে কায়ব্যূহও ধারণ করিতে পারেন, ইচ্ছামত তাঁহারা নানা আকৃতি ধারণ করেন এবং একদা বহু রূপ ধারণ করেন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন ["ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে"] ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহু রূপ ধারণ করেন। অতএব দেখিলাম যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় আর্য্যগণ এবং প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ মধ্যে দেবতাদের শরীর আছে কি না তাহা দেখা যায় কি না এবং তাহা কিরূপ শরীর, এমন কি, দেব-তাই আছেন কি না, এ সকল গুরুতর বিষয়ে মর্ম্মান্তিক মতভেদ। যেখানে মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যগণের মধ্যে এইরূপ মতভেদ, সেখানে আমাদের মত মূর্খগণের মৌনাবলম্বনই বিধেয়। তবে

এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অপেক্ষা সায়ন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এ দেশীয় আচার্য্যগণ বেদ এবং হিন্দু শাস্ত্র একটু বেশী বুঝিতেন। দেবতাদের শরীর আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কিরূপ, সে সব বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে, কারণ তাহার কিছুই জানি না ও বুঝি না। সকল দেবতাই যে রূপক নহেন এবং দেবতা যে আছেন, ইহা মানিয়া লইতে কোনই আপত্তি দেখি না। পূর্ব্বে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেবতা যে আছেন, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মানুষ পর্য্যন্ত আসিয়াই সৃষ্টির বিকাশ শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

সাংখ্য মতে দেবগণ পুরাকল্পের মুক্ত পুরুষ। কল্প কাহাকে বলে, তাহা একবার দেখা যাউক। কলিযুগের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর। দ্বাপর যুগ ইহার দ্বিগুণ, ত্রেতাযুগ ইহার ত্রিগুণ এবং সত্যযুগ ইহার চতুর্গুণ। এই চারি যুগে অর্থাৎ কলিযুগের দশগুণ সময়ে এক মহাযুগ। এইরূপ ৭১মহাযুগে এক মন্বন্তর। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। সুতরাং চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের পরিমাণ ফল ১৪ গুণ ৭১ মহাযুগ, অর্থাৎ ৯৯৪ মহাযুগ। এক মন্বন্তরের শেষ ও অপর মন্বন্তরের আরম্ভের মধ্যে যে সময়, তাহাকে সন্ধি বলে। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের মধ্যে তেরটি সন্ধি। তাহাদের সমষ্টি পরিমাণ ছয় মহাযুগ। সুতরাং এক কল্পের পরিমাণ এক

হাজার মহাযুগ। এই এক কল্প বা এক হাজার মহাযুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। বিষ্ণু পুরাণে আছে 'চতুর্যুগ সহস্রন্ত ব্রহ্মণোদিন-মুচ্যতে।" এই কালের পরিমাণ চিন্তা করিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ব্রহ্মার একদিনে একটা সৃষ্টি কাণ্ড শেষ হয়। দিনের প্রারম্ভে যে জীবাত্মা স্থাবর খনিজরূপে সম্পূর্ণ তমোগুণাবৃত ছিল, তাহাই বিকশিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মার দিন শেষে শুদ্ধ সত্বগুণান্বিত মুক্ত মানুষ রূপে পরিণত হইল। তারপর ব্রহ্মার রাত্রি। তাহাও সহস্র মহাযুগব্যাপী। যতক্ষণ রাত্রি, ততক্ষণ সমস্ত বিশ্ব সুপ্ত থাকে। তখন কোন সৃষ্টি কার্য্য হয় না। তখন প্রলয়ের তবস্থা।

আবার ব্রহ্মার দিন আরম্ভ এবং তৎসঙ্গে নূতন সৃষ্টিরও আরম্ভ। তখন গত কল্পের যে সকল মুক্ত পুরুষ, তাহারাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিয়োগে বিশ্বের নানা বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। তখন আর তাঁহাদের জড় দেহের কোন আবশ্যকতা থাকে না। জড় দেহের যে কাজ, তাহা গত কল্পেই তাহাদের হইয়া গিয়াছে। এও সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিয়ম। যেমন ভাষা শিক্ষা হইয়া গেলে, আর ব্যাকরণ পড়িবার আবশ্যকতা থাকে না। কলেজে ব্যাকরণ পড়ায় না।

পুরাকালের এই সব মুক্ত পুরুষগণই বর্ত্তমান কল্পের দেবতা অথবা Angel. ইহাদের পক্ষেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হয় নাই। যাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়িয়াছেন, তাহারাই জানেন

যে, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রতি মন্বন্তরেই নূতন হন। মন্বন্তরের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি সকল দেবতারই পরিবর্ত্তন হয়। যিনি ইন্দ্র ছিলেন, তিনি অপর একজনকে ইন্দ্রত্বের চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আরও উপরে উঠিয়া চলিয়া যান। মনু এবং লোকপালগণ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এক কল্পে ১৪ জন মনুর অধিকার। সুতরাং ইন্দ্রাদি সকল দেবতাই কল্প মধ্যে চতুর্দ্দশ বার পরিবর্ত্তিত হন। একই মন্বন্তরের মধ্যে তাহাদের পরিবর্ত্তন নাই। মানুষই যে ক্রমে বিকশিত হইয়া দেবত্ব লাভ করে, হিন্দু শাস্ত্রে তাহার বহু উল্লেখ আছে। নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বালী আগামী মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন। সুরথ রাজা কিরূপে সাবর্ণিক মন্বন্তরের মনু হইবেন, তাহা যাঁহারা চণ্ডী পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে আছে যে, দেবর্ষি নারদ পুরাকল্পে এক ব্রাহ্মণের দাসীর পুত্র ছিলেন। অতএব দেখা গেল যে, শাস্ত্রকারদিগের মতে আজ যিনি মানুষ তিনি যদি উপযুক্ত সাধনা করেন, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোযোগী ছাত্র হন, তবে কল্পান্তে তিনিই দেবতারূপে সৃষ্টির কোন বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইতে পারেন, এমন কি ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারেন।

এইত গেল দেবতাদের ব্যাপার। ব্রহ্মার নিজের অবস্থা কি? এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের যেরূপ নির্ভীক স্বাধীন চিন্তা তাহা ভাবিতে

গেলে আমাদের মত সামান্য মানবের বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়। ইন্দ্রাদি দেবতাই ক্রমে বিকশিত হইয়া ব্রহ্মত্বে উন্নীত হন। ব্রহ্মার দিনের ৩৬০ দিনে এক ব্রাহ্ম বৎসর। তার শতবর্ষ পরিমিত কাল ব্রহ্মার আয়ু। যখন ব্রহ্মার আয়ুর অবসান হয়, তখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। ব্রহ্মার রাত্রিকালে যে প্রলয় হয় তাহাতে ভূর্ভুবঃস্ব এই তিন লোকের মাত্র প্রলয় হয়, ঊর্দ্ধতন চারিলোক থাকিয়া যায়। তখন প্রকৃতি একেবারে ব্রহ্মে লীন হন না, কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মার আয়ুর শেষে যে প্রলয় হয়, তাহাতে সত্যলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোকেরই প্রলয় হয়। প্রকৃতিরও প্রলয় হয়। তখন প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন থাকেন। যতদিন ব্রহ্মার আয়ু, এই মহাপ্রলয়ের অবস্থাও ততদিন থাকে। তারপর ব্রহ্ম হইতে আবার নূতন ব্রহ্মার উৎপত্তি, আবার নূতন প্রকৃতির উৎপত্তি, আবার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ ও নূতন সৃষ্টি আরম্ভ। এইরূপ ক্রমাগত চলিতেছে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, তেত্রিশ কোটি কেন, তদপেক্ষাও বেশী দেবতা থাকিতে কিছুই বাধা নাই, কারণ কত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে, কত মুক্ত পুরুষ দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? দেবতাই যদি অসংখ্য হন, তবে ব্রহ্মাই বা অসংখ্য কেন না হইবেন? হিন্দুশাস্ত্রে বহু স্থানে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে। এক একটী সৌরমণ্ডলকে

এক একটী ব্রহ্মাণ্ড বলে। ঋষিদিগের মতে এইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রতিব্রহ্মাণ্ডে এক এক ব্রহ্মা। * তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপী। তাঁহাকে জন্য ঈশ্বর বলে। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ত্ব) নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"ব্রহ্মাণ্ড যখন অসংখ্য, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও অসংখ্য। এই সম্বন্ধে দেবী ভাগবত এইরূপ লিখিয়াছেন।

"সংখ্যাচেৎ রজাসমস্তি ন বিশ্বানাং কদাচন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে॥
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥"

বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কখনও করা যায় না। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা গণনাতীত।

কোটি কোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কবিতানি তু।
তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবা।

ব্রহ্মাণ্ড যে কোটি কোটি, অযুত অযুত, তাহা উক্ত হইয়াছে। সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ["ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ॥]

"ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং যঃপরঃ সমহেশ্বরঃ।"

হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবগণ ব্রহ্মের প্রধান প্রধান শক্তি। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবগণেরও উপরে, তিনিই মহেশ্বর।

---

* ব্রহ্মতত্ত্ব পৃ ২২১।

এসম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।

হরয়শ্চ অসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ॥

অসংখ্য রুদ্র, অসংখ্য ব্রহ্মা, অসংখ্য বিষ্ণু, কিন্তু মহেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।"

পুরাণ, উপনিষদ্ এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থের বহুস্থলে এই বিষয়ে একই কথা বলা হইয়াছে। মহেশ্বরকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বলা হয়।

এক এক জন্য ঈশ্বর এক এক ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। যিনি সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর, তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মায় সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য উপনিষদ্ এক স্থানে সম্রাট ও রাজার তুলনা করিয়াছেন। কেথাও কোথাও জন্য ঈশ্বরকে প্রজাপতি এবং নিত্য ঈশ্বর বা মহেশ্বরকে প্রজাপতিপতি বলা হইয়াছে।

পতিং পতীনং পরমং পরস্তাৎ।" (শ্বেত ৬।৭) অর্থাৎ সেই পরাৎপর পরম পুরুষ, প্রজাপতির পতি। বিষ্ণুপুরাণে ঈশ্বর ও মহেশ্বরকে পৃথক্ করিবার জন্য ঈশ্বরকে কোথাও কেথাও বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে মহা বিষ্ণু বলা হইয়াছে।"

হীরেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে আর একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের নিকট উপহার না দিলে আমার ভাল বোধ হইতেছে না। স্থানটী অতি চমৎকার—

"ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে পরমাণুর যে স্থান, ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টি যে মহাবিশ্ব (মহেশ্বরের যাহা লীলাক্ষেত্র)—তাহার সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের সেই স্থান। কারণ মহেশ্বর রূপ অসীম সমুদ্রে ঈশ্বরগণ—ব্রহ্মা সকল—বুদ্ বুদ্ স্থানীয়। সেই জন্য ভক্ত কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন,—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত নতুয়া অদি অবসানা॥ তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমায়ত সাগর লহরী সমানা॥

সাগরের বক্ষে অনন্ত লহরী ভাসিতেছে, হাসিতেছে, আবার বিলীন হইতেছে। ব্রহ্মসাগরেও সেইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মা জন্মিতেছে, কল্পে কল্পে লীলা করিতেছে, পরে বিলীন হইতেছে। সেইজন্য রূপকের ভাষায় বলা হইয়াছে যে, মহাবিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে সহস্র সহস্র নাল উদ্ভূত হয়—প্রত্যেক নালে এক একটী সৃষ্টিপদ্ম এবং প্রত্যেক পদ্মে এক একজন পদ্মযোনি ব্রহ্মা। এই তত্ত্ব বিশদ করিজন্য পুরাণকার একটী সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন। তাহা এই—

একদিন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কোন কার্য্যোপলক্ষে মহা বিষ্ণুর সদনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের ব্রহ্মার ধারণা ছিল যে, তিনি ভিন্ন আর সৃষ্টিকর্ত্তা নাই—আর এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আর ব্রহ্মাণ্ড নাই। তাঁহার এই ভ্রান্তি দুর করিবার জন্য মহাবিষ্ণু এক মায়াজাল বিস্তার করিলেন। ব্রহ্মা যখন বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, দ্বারী এক পঞ্চমুখ গণেশ। ইহাতে ব্রহ্মা কিছু বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন এ আবার কি? আমার সৃষ্ট

গণেশের ত এক মুখ। এ গণেশ কোথা হইতে আসিল ?' পরে বিস্ময়ের ভাব সংবরণ করিয়া দ্বারী গণেশকে কহিলেন 'আমি ব্রহ্মা, ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপনি কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা ? ভগবানের কাছে কাহার নাম বলিব ?" ব্রহ্মার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি বলিলেন—'কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা ? ব্রহ্মাণ্ড ত এক এবং আমিই তাহার স্রষ্টা। ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক ত আমারই সৃষ্ট।' গণেশ বলিলেন 'বুঝিয়াছি। আপনি পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা। আচ্ছা সংবাদ দিতেছি।' পরে সংবাদ দিয়া ব্রহ্মাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া ব্রহ্মা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। দেখিলেন, কারণার্ণবে অনন্তদল কমল ফুটিয়াছে, আর সেই কমলের প্রতি দলে এক একটী রূপসী কন্যা অধিষ্টিত হইয়া এক একটী ক্রীড়া-গোলক লইয়া খেলা করিতেছে। ব্রহ্মা সেই কমল দলের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলন,—পারিলেন না। কারণ সে কমল অনন্ত দল। ব্রহ্মা বিমোহিত হইয়া মুগ্ধ নেত্রে সেই কন্যাগণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কত যুগ বহিয়া গেল ; ব্রহ্মার সে জ্ঞান নাই। সহসা একটী কন্যার ক্রীড়া-গোলকটী চূর্ণ হইয়া গেল। সে কন্যা করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তাহার আর্ত্তনাদে বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা তুমি কাঁদ কেন ? একটী গোলা ভাঙ্গিয়াছে, তাহার জন্য ভাবনা কি ? আমি ব্রহ্মা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের

সৃষ্টিকর্ত্তা।:এখনই তোমাকে এরূপ কত গোলা সৃষ্টি করিয়া দিতেছি। কন্যা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তাহাকে ভুলাইবার জন্য নানা মতে একটী ক্রীড়া-গোলক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কিছুতেই সেগোলক নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা তখন স্তম্ভিত হইয়া বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। পঞ্চমুখ গণেশ এতক্ষণ ব্রহ্মার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। তিনি ব্রহ্মার মোহ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন— 'এই কারণার্ণব-শায়ী অনন্ত-দল কমল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রূপকস্বরূপ। ইহার এক একটী দলে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড। এক একটী কন্যা এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি সৃষ্টির বিকাশ কালে ব্রহ্মাণ্ড রূপ ক্রীড়া-গোলক লইয়া ক্রীড়া করেন। প্রলয়ের সময় ঐ গোলক চূর্ণ হইয়া যায়। অদ্য আপনি একটী ব্রহ্মাণ্ডের ঐ রূপ প্রলয় প্রত্যক্ষ করিলেন। আপনার সাধ্য কি আপনি যে ঐ ব্রহ্মাণ্ড. সৃষ্টি করেন? প্রলয়রাত্রির অবসানে ঐ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উহা আবার সৃষ্ট হইবে। সৃষ্টির সীমা নাই। জগৎ অসীম। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কমলের অনন্ত দল।"

অতএব দেখা গেল যে, হিন্দু শাস্ত্র মতে ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক একটী সূর্য্য এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। এ বিষয়ে প্রাচ্য ঋষিদের শিক্ষা ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শিক্ষায় কোন

প্রভেদ নাই। কিন্তু ঋষিরা বলেন যে, যেমন ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, সেইরূপ স্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও অসংখ্য। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই ত্রিমূর্ত্তিতে এক এক জন্য ঈশ্বর ব্রহ্মা বিরাজিত। এই জন্য ঈশ্বরই সেই সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ। ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবকারী সবিতা। গায়ত্রীতে ইহাঁরই বরণীয় ভর্গকে ধ্যান করা হইয়াছে। তিনিই ঈশ্বর। যিনি মহেশ্বর, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর। "ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।" তিনি দেবতাদিগেরও পরম দেবতা। "ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্"। তিনি প্রজাপতিদিগেরও পতি এবং পরাৎপর। "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।" তিনি নিত্য ঈশ্বর, জন্যঈশ্বর নহেন। জন্যঈশ্বরই স্টিকর্ত্তা সবিতা। যিনি নিত্য ঈশ্বর, তিনি স্টি করিবেন কেন? তাঁহার কি অভাব যে স্টিরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে? তিনি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। সিন্ধুতে ও বিন্দুতে যে প্রভেদ, পরব্রহ্ম ও স্টিকর্ত্তা ব্রহ্মায় সেই প্রভেদ।

মানবের বিকাশ এবং মুক্তি বিষয়ে দেবতাদের অশেষবিধ কার্য্য আছে। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষকের কাজ করেন। সর্ব্ব ধর্ম্মের শাস্ত্রেই নানারূপে তাহার উল্লেখ আছে। বাইবেল গ্রন্থে জবের পরীক্ষা স্বয়ং ঈশ্বরই করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। জব্ বড় বিশ্বাসী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। ঈশ্বর জবের ভক্তি ও বিশ্বাস পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করি-

লেন। জবের অসংখ্য গবাদি পশু এবং সম্পত্তি ছিল, তাহা সব গেল! তাহার পুত্রকন্যাগণ আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই মারা গেল। তারপর জবের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য বিস্ফোটক হইল। কিছুতেই জবের ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি টলিল না। তিনি এক একটী বিপদের সংবাদ শোনেন, আর ভক্তি ভরে বলেন "প্রভু, তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই নিয়াছ, তোমার নাম ধন্য হউক।" কিছুতেই যখন জবের বিশ্বাস টলিল না, তখন ঈশ্বর তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বহুগুণে আবার ফিরিয়া আসিল,তাঁহার আবার ৭ পুত্র ও তিন কন্যা হইল এবং তিনি পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্রাদি লইয়া আবার মহা সুখে সংসার করিলেন এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিলেন।

দেবতাদের সম্বন্ধে যাহার যেরূপ বিশ্বাস, সে সেইরূপ দেবতাই গড়ে। একটা কথা আছে যে, ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা নয়, মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহুদিরা উগ্রমূর্ত্তি দণ্ডধর রাজার ভাবেই ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঈশ্বর Angry God, Jealous God—তাঁহাদের ঈশ্বরকে ভয় করিতে হয়। যাঁহারা জবের মত ভাললোক, তাহারা Godfearing. যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পিতৃভাব দেখিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরকে পুত্র, সখা, সুহৃদ্, স্বামী প্রভৃতি কত ভাবেই না দেখিয়াছেন। পুরাণকার ব্রহ্মাকে একদম পিতামহ করিয়া ফেলিয়াছেন। কথাটা আমার বড়ই ভাল

লাগে। ব্রহ্মাকে পিতামহ বলিবার অনেক কারণ আছে। আমি সে সব পৌরাণিক কারণ ছাড়িয়া পিতামহ কথাটার মধ্যেই যে মধুরতা আছে, তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পিতামহ পিতারও পিতা, মহাগুরু, পরম পূজনীয়। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বাল্যকালে ঠাকুরদাদা পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ঠাকুরদাদার কোল কি মধুর পদার্থ। বাবা মারেন, ঠাকুরদাদা মোটেই মারেন না। ঠাকুরদাদার কাছে মোটেই ভয় নাই। সেখানে কেবলই ভালবাসা। বাবার কাছে গেলেই মনে ভয় হয়, মুখ গম্ভীর হইয়া আসে। ঠাকুর দাদার কাছে আসিলে যেন মনটা হাল্‌কা হইয়া যায়। ঠাকুরদাদার সঙ্গে কৌতুক করা পর্য্যন্ত চলে। যিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁর কাছে দিনরাত গম্ভীর হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? ঠাকুরদাদা আবার বাল্যকালের অদ্বিতীয় সুশিক্ষক।

পুরাণের ভাষা অনেক সময় প্রহেলিকার ন্যায়। এইরূপ প্রহেলিকার ভাষায় শাস্ত্রকথা লিপিবদ্ধ করা প্রাচীনকালের একটা রীতি। বোধ হয়, অনধিকারীর চক্ষুর অন্তরাল করার জন্যই এইরূপ প্রহেলিকার ন্যায় ভাষা ও মিশ্র দেশের চিত্রলিপি (Hieroglyphics) ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার ফল ভাল মন্দ দুইই হইতে পারে, এবং হইয়াছেও তাই। বর্ত্তমান কালে আমরা যদিও এ প্রথা পছন্দ না করি, তথাপি যাহা আছে, তাহা লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে। পুরাণে দেব-

চরিত্র অনেকস্থলে যেরূপভাবে বর্ণিত আছে, তাহার ভাষাগত অর্থমাত্র গ্রহণ করিলে দেবতা দূরে থাকুক, মানুষের পক্ষেও ওরূপ চরিত্র নিন্দনীয়। দেবতা কামুক, দেবতা হিংসুক, দেবতা ক্রোধপরায়ণ, দেবতা লোভী, দেবতা ভীরু ইত্যাদি কত কথাই না আছে। হিন্দু ও গ্রীক এই উভয় প্রাচীন জাতির পুরাণের মধ্যেই এরূপ বর্ণনা বহুস্থলে লক্ষিত হয়। কিন্তু কুৎসিৎ শুক্তির ভিতর যেমন উজ্জ্বল মুক্তা থাকে, তেমনি ঐসকল আপাতকুৎসিৎ বর্ণনার মধ্যেও সার সত্য সকল নিবদ্ধ রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের একটী প্রথম শিক্ষাই এই যে দেবগণ পুরাকল্পের মুক্তপুরুষ। তাই যদি হয়, তবে তাহাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, হিংসা, ইত্যাদি কিছুতেই আসিতে পারে না। অতি নিম্ন শ্রেণীর যে দেবতা, তাহাদের মধ্যেও এসব থাকিতে পারে না। পুরাণে দেখা যায় যে, যখন কোন যোগী বা সাধক মহাপুরুষ অত্যুগ্র তপস্যা আরম্ভ করেন, তখনই ইন্দ্রাদি দেবগণের ভয় হয় যে, পাছে তাঁহারা স্বাধিকারচ্যুত হন, অমনি তাঁহারা নানা কৌশলে যোগীর সমাধি ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন। দেবতাদের এই যে সমাধিভীরুত্ব, তাহা কি বাস্তবিকই ভীরুতা? ইন্দ্রাদি দেবতাদের ত ভয় করিবার কোন কারণই নাই। চলিত মন্বন্তরের মধ্যে ত আর ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিছুতেই যাইবে না। মন্বন্তর শেষ হইয়া গেলে আর কিছুতেই তাঁর ইন্দ্রত্ব থাকিবে না। তিনি কেন সাধকের সমাধিতে ভীত হইবেন?

কোটি কোটি দেবতা ত আছেই, তার উপর যদি আর একটী বাড়ে, তাহা হইলে ইন্দ্রের কি ক্ষতি? যিনি দেবরাজ, তাহার ভয়ই বা হইবে কেন, হিংসাই বা হইবে কেন? কিন্তু দেবরাজ বলিয়াই মানুষের প্রতি তাঁহার একটা কর্ত্তব্য আছে। তিনি সাধককে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, সেই সাধক মুক্তির উপযুক্ত পাত্র কি না। যদি সাধকের মনের নিভৃত স্থানে কোন পাপ, কোন পার্থিব বাসনা লুক্কায়িত থাকে, সহস্রলোচনের কাছে ত তাহা প্রত্যক্ষবৎ, যদিও সাধকের নিজের কাছে তাহা অজ্ঞাত। দেবতা তখন সেই লুক্কায়িত পাপ-বাসনা এমন ভাবেই সাধকের প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দিবেন যেন সাধক তাহা জয় করিতে পারেন। দেহের কোন নিভৃত স্থানে বহু মাংসের নীচে একটু পূয রহিয়াছে, রোগী নিজেও তাহা জানে না, কিন্তু তাহার চিকিৎসক তা জানেন। তিনি রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই পূয নিষ্কাষিত করিলে তবেত সেই রোগী সুস্থ দেহ লাভ করিবে। রোগীর শরীরে অস্ত্র বিদ্ধ করেন বলিয়া ডাক্তার তাহার শত্রু নন, পরম মিত্র। এই কয়টী কথা মনে রাখিলে দেবচরিত্র একটু সুবোধ্য হইবে।

বিশ্বামিত্র মহাতপস্বী ও মহাসাধক। বৃক্ষের গলিত পত্র মাত্র তাঁহার আহার্য্য। তাঁহার বিশ্বাস যে তিনি এতদূর সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে, দেবত্ব ত তাঁহার পক্ষে অনায়াস-লভ্য, তিনি সৃষ্টি-কর্ত্তার আসন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু দেবায়তনের

সুমার্জ্জিত উদ্যানে যেমন বিষধর কালভুজঙ্গ কোথায় এক কোণে লুকাইয়া থাকে, যেমন কুসুমের মধ্যে কীট থাকে, সেইরূপ তাঁ'র সাধনা-পূত চিত্তের এক কোণে কোথায় যে কামের একটু কণিকা লুকাইয়া আছে, তাহা তিনি নিজেও জানেন না। দেবচক্ষু তাহা দেখিয়াছে—ইন্দ্র ত সহস্রলোচন। বিশ্বামিত্রের তখন অস্ত্র-চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ইন্দ্রের আদেশে মেনকা আসিয়া বিশ্বামিত্রের কাছে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের পতন হইল। অথবা ডাক্তারি ভাষায় বলিতে গেলে, operation successful হইল। নিজের দুর্ব্বলতা যেই তাঁর চক্ষে পড়িল, অমনি বিশ্বামিত্রের ভয়ানক আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল। হিন্দু চিত্রকর রবিবর্ম্মা একখানা চিত্রে অতি বিশদ রূপে এই ভাবটী অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই আত্মগ্লানির আগুনে পুড়িয়া বিশ্বামিত্র, পবিত্র, নিষ্পাপ ও শুদ্ধ হইলেন। তিনি ঋষিত্বে উন্নীত হইলেন। তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইল। এইরূপে দেবগণ এক সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং পরীক্ষা, উভয় কার্য্যই করিয়া থাকেন।

সমাধি-ভীরুত্ব ত দূরের কথা, দেবতাদের বিরুদ্ধে তদপেক্ষাও গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে। ব্রহ্মাদি অনেক দেবতারই লাম্পট্য দুর্নাম বিলক্ষণ রূপে রটিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নামেই এই দুর্নামটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান মিশনরি আছেন, যাঁহারা এই দুর্নাম উপলক্ষ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের উপর অযথা আক্রমণ করিয়া

থাকেন। বলা বাহুল্য যে, খ্রীষ্টান মিশনরিদের মধ্যে অনেক দেবতুল্য ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা নানা কারণে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন ও নমস্য। কিন্তু বলিতে কষ্ট হয় যে, মিশনরিদের মধ্যেই এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা বিনা কারণে হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াও তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন এবং হিন্দুদের মনে অনর্থক কষ্ট দেন। তাঁহাদের আক্ষেপ এই যে, এখনও হিন্দুরা এই লম্পট কৃষ্ণের পূজা পরিত্যাগ করে নাই। কৃষ্ণ শুধু লম্পটই নন, তিনি চোর। তিনি গোপীদের ননী ত চুরি করেনই, তাহাদের বস্ত্রও চুরি করেন, হৃদয়ও চুরি করেন। শেষোক্ত শ্রেণীর মিশনরিগণ এইরূপ দেবতার পূজকদের জন্য শেষ বিচারের দিন অনন্ত নরক ও গন্ধকাগ্নির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র কৃষ্ণ-চরিত্র আলোচনা করা অসম্ভব। এখানে কেবল বস্ত্রহরণ সম্বন্ধেই দুইটা কথা বলিব।

কোন গ্রন্থ পড়িয়া তাহার রস গ্রহণ করিতে হইলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সেই গ্রন্থের লেখকের অথবা যাহাদের জন্য সেই গ্রন্থ লেখা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে মনে মনে একাত্মভাব জন্মাইতে হইবে। নচেৎ গ্রন্থ পাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র। তাহার কিছু মাত্রও সার গ্রহণ করা হইবে না। কোরাণ পড়িতে হইলে মনটাকে ভক্ত মুসলমানের মত না করিতে পারিলে কোরাণ পাঠ বৃথা। খ্রীষ্টানের মত তন্ময় হইয়া না পড়িলে বাইবেলের রস গ্রহণ করা হইবে না। সেইরূপ ভাগবত

পড়িতে হইলে অন্ততঃ মনে মনেও সেই সময়ের জন্য বৈষ্ণব হওয়া চাই, নচেৎ ভাগবতের এক অক্ষরও বোঝা হইবে না। আজন্ম-যোগী শুকদেব যাহার বক্তা, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ মৃত্যুর সপ্তাহ পূর্ব্বে যে কৃষ্ণলীলা শুনিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহার মধ্যে কোন অশ্লীলতা থাকা অসম্ভব। বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। জীবাত্মার নাম গোপী। এই সংসারই ব্রজভূমি। এই কথাগুলি সকল বৈষ্ণবই জানেন। জগতে স্ত্রী পুরুষ সকলেই গোপী। আসল পুরুষ কেবল সেই নারায়ণ। যে গোপী পুরুষোত্তমের দাসীবৃত্তি করিবার অধিকারিণী হইল, সেত ধন্যা। বস্ত্র-হরণ লীলার অতি গভীর অর্থ। বস্ত্র যেমন দেহের আবরণ, সর্ব্ব প্রকার মায়া, মোহ, ছল, কপটতা সেইরূপ জীবাত্মার আবরণ। যে ভগবানের যত কাছে, তার কপটতার আবরণ তত কম। সাধারণ মানুষও যখন ভগবানের সিংহাসন-প্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন সেও কপটতাও লজ্জা প্রভৃতির আবরণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মৃত্যু সময়, কঠিন ব্যাধির সময়, জীবের জন্মের সময় যখন ভগবানের সিংহাসনের ছায়া-তলে মানুষ উপস্থিত হয়, যখন অনন্ত সুন্দর চিরকিশোরের বংশীরব কানে আসিয়া পৌছে, তখন কি আর হৃদয়ে কোন আবরণ থাকে? তখন কপটতা থাকে না, লজ্জাও থাকে না। তখন এই জড় দেহটারও আবরণ আছে কি নাই, সেদিকে দৃষ্টি থাকে না। লজ্জা-বিবশা কুলবধূও প্রসবের সময় লজ্জাহীনা হয়, কারণ তখন যে সে ভগবানের

বড় কাছে। শিশু ভগবানের বড় কাছে, কাজেই শিশুর ছল নাই। কপটতা নাই, লজ্জা নাই, দেহের বস্ত্রও নাই। বরং বস্ত্রের আবরণে শিশুর উদ্বেগ বোধ হয়। পরম যোগী শুকদেব দিগম্বর ছিলেন। স্বর্গীয় ত্রৈলঙ্গ স্বামী দিগম্বর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সব গোপীদের বস্ত্র-হরণ করিয়াছিলেন। যদি তুমি কখনও ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাক, যদি একবার ভক্তির যমুনায় স্নান করিয়া তোমার চিত্তকে পবিত্র করিয়া থাক, তবেই তুমি নিজের জীবনে বস্ত্রহরণ লীলা বুঝিতে পারিবে, নচেৎ নয়। মায়াবস্ত্রে সমস্ত জগৎ আবৃত। যতদিন জীব মায়ার উপরে না উঠিবে, মায়ারূপ বস্ত্র ত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই। ভগবানের কাছে যাইবার পথেই তিনি আগে জীবাত্মার বস্ত্রহরণ করিয়া লন, নচেৎ সেদিকে প্রবেশ নিষেধ। বৈষ্ণব ভাবে যদি বৈষ্ণব গ্রন্থ না পড় তবে তোমার ঐ গ্রন্থ স্পর্শ করিবারও অধিকার নাই।

ব্রহ্মার নামে একটা গুরুতর বদনাম আছে যে, তিনি স্বীয় কন্যা বাগ্দেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গর্ভে অপত্য উৎপাদন করিয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তার নামে বড়ই গুরুতর অভিযোগ। কথাটার ব্যাখ্যা কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়।

বিশ্বের যাহা উপাদান কারণ, তাহা শাস্ত্রে অদিতি বা মূল প্রকৃতি নামে উক্ত হইয়াছে। ইনি শতরূপা। শাস্ত্রে ইনি বহু নামে উক্ত হইয়াছেন। প্রকৃতি, প্রধান, তমঃ, রয়ি, অপ্, মহৎ

ব্রহ্ম প্রভৃতি সেই এক মূল প্রকৃতিরই নামান্তর মাত্র। সৃষ্টির প্রারম্ভে ইনি আকাশ তত্ত্বরূপে প্রথম প্রকাশিত হন। "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" তৈত্তি ১।২।১। আকাশের গুণ শব্দ, এইজন্য প্রকৃতির অপর নাম বাক্ বা বাগ্দেবী। ইহাকে গ্রীক ও রোমকগণ Logos বা Verbum বলিতেন। ইহাকে জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে সরস্বতীও বলে। সরস্ শব্দের অর্থ তেজ বা জ্যোতিঃ। মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতি বীজ ভাবে ব্রহ্মে লীন থাকেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম হইতে ইনি আকাশরূপে উদ্ভূত হন, এই জন্য বাগ্দেবীকে ব্রহ্মার কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় না, তাহাতে ব্রহ্ম সত্ত্বার অনুপ্রবেশ হওয়া চাই। এই অনুপ্রবেশকে ঈক্ষণ বলে। ("স ঐক্ষত") ব্রহ্মসত্ত্বা প্রকৃতির সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মের এক নাম বিষ্ণু—বিশ্ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। প্রকৃতিতে ব্রহ্মের এই অনুপ্রবেশই প্রকৃতির গর্ভাধান। গীতায় এই তত্ত্ব উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে,

মমযোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয় সম্ভবন্তিযাঃ।
তাসাং ব্রহ্মমহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

গীতা। ১৪—৩।৪।

এইরূপে বাক্‌দেবী যিনি মহদ্ ব্রহ্ম বা প্রকৃতি—তিনি ব্রহ্মার সহ-বাসে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন। গ্রীক পুরাণে আছে যে Leda হংস-রূপী Zeusএর সহবাসে অণ্ড প্রসব করেন। হিন্দু শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে ব্রহ্মাকে হংসরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি "মুনি-জন মানস হংস।" তিনি মানস-সরোবরের জলে সন্তরণ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতির নাম অপ্। মনুসংহিতায় আছে "অপ-এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাকিরৎ।" মহেশ্বর আদিতে অপ্ (প্রকৃতি) সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ আধান করিলেন। ঈশোপনিষদে আছে "তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি।" অপ্ অর্থাৎ কারণার্ণব, অব্যক্ত প্রকৃতি। নার শব্দের অর্থ জল। কারণার্ণব শায়ী বলিয়া বিষ্ণুর এক নাম নারায়ণ। মাতরিশ্বা অর্থাৎ প্রাণ, পুরুষ। "মাতরি (in matter) শ্বসতি (moves) = মাতরিশ্বা। মাতর প্রকৃতির একটী সংজ্ঞা। খ্রীষ্টানদের Virgin mother। তাঁহারাও বলেন, Holy ghost moving on the face of the waters. * প্রকৃতি এবং পুরুষ বা ব্রহ্মাকে গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞও বলা হইয়াছে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে—

"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্॥
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥
গী। ১৩।২৬

---

* ব্রহ্মতত্ত্ব। ২৬০

বিশ্বে স্থাবরজঙ্গম যত কিছু পদার্থ আছে, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই উৎপন্ন হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে আপনারা দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বাগ্‌দেবী-সঙ্গম ব্যাপারটা কি। পুরাণের ভাষা কৌশলময়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনধিকারিগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে না পারে, সেইজন্য বিচিত্র সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক কথা পুরাণে প্রহেলিকাবৎ বর্ণিত আছে। এই সম্বন্ধে Madam Blavatsky'র উক্তি প্রণিধানযোগ্য।—

"And here we may incidentally point out one of the many unjust slurs thrown by the "good and pious" missionaries in India on the religion of the land. The allegory in the শতপথব্রাহ্মণ, that Brahma as the father of men, performed the work of procreation by incestuous intercourse with his own daughter Vach, also called Sandhya, Twilight, and Shatarupa, of a hundred forms, is incessantly thrown in the teeth of the Brahmans, as condemning their "detestable false religion." Madam Blavatsky তাহার পর মিশনরি সাহেবদের উপর একটু তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন—"There is certainly a cosmic and not a physiological meaning attached to the Indian allegory, since Vach is a permutation of

Aditi and Mula-Prakriti or Chaos, and Brahma a permutation of Narayan, the spirit of God entering into and fructifying Nature; and, therefore, there is nothing phallic in the conception at all."*

ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক।

হিন্দু জাতিটাই এমন ভাবপ্রবণ যে, তাঁহারা রূপক ছাড়া সাদা ভাষায় কোন কথাই কহিতে জানে না। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে যে রূপক থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বিশেষত যখন ইচ্ছা করিয়াই রূপকের আবরণে অনেক সত্য আবৃত করিয়া রাখিবার আবশ্যক হয়। যাঁহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের, যাঁহারা হিন্দুর চক্ষে হিন্দুশাস্ত্র পড়েন না, অথবা হিন্দুর হৃদয় লইয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করেন না, তাঁহারা যে পুরাণ বুঝিবেন না, তাহাতে বিচিত্র কি? তাঁহাদের মতে ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, প্রভৃতি সকলেই লম্পট আখ্যা পাইয়াছেন। তা' বলিয়া আমরা সকলেই না বুঝিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে তাঁহাদের অনুসরণ করিব কেন? আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ যদি আমরা না বুঝিতে পারি, তবে তাহা অপেক্ষা পরম দুর্ভাগ্য আর আমাদের কি হইতে পারে?

বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিরাট ব্যাপার। বিশেষ ভাবে তার আলোচনা করিতে পারি, এরূপ সাধ্য আমার নাই। আজ আপনাদের

---

* Secret Doctrine, Vol I, p. 465.

কাছে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকৌশল, শিক্ষক, পরীক্ষা ও পরীক্ষকদের সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে কিছু নিবেদন করিলাম। যাহা বলা হইল, অকথিত বিষয় তাহার শতগুণ অধিক রহিয়া গেল। আমার প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্তির কথাটার একটু আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। যেখানে পাঠশালা আছে, সেখানেই বেতও আছে,—অন্ততঃ আমাদের কালে ছিল। অতি বাল্যকালে যখন ইংরাজি স্কুলে যাই নাই তখন কোন বয়স্ক আত্মীয় রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজি স্কুলে কলের বেত আছে। বানান ভুল বা অঙ্ক ভুল হইলে সে বেত আপনা আপনি আসিয়া ভুলের গুরুত্ব অনুসারে পিঠে পড়ে। তখন রহস্য বুঝিবার বয়স হয় নাই। ভয়-কম্পিত বাল্য হৃদয়খানি লইয়া যখন সত্য সত্যই ইংরাজি স্কুলে আসিলাম, তখন সেই কলের বেতের অত্যন্ত অভাব দেখিয়া মনে পরম আনন্দ হইল। আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন সংসার চিনিলাম, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচিত হইলাম তখন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, এ বিদ্যালয়ে কলের বেত ছাড়া অন্য বেতই নাই। বেতও যেমন কলে চালিত হইয়া আসিয়া পিঠের উপর পড়ে, ভাল ছাত্রের পুরস্কার ও বৃত্তিগুলিও সেইরূপ কলেই আসিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হয়। হিন্দুরা এই কলের বেত ও কলের পুরস্কারের নাম রাখিয়াছেন কর্ম্মফল। গ্রীকগণ ইহাকে বলিত, Nemesis, বর্ত্তমান Theosophist'গণ

ইহার নাম দিয়াছেন Law of Karma অথবা Law of Retribution. তুমি জীবনে যেমন কর্ম্ম করিবে, ঠিক যথাসময়ে কর্ম্ম-দেবতা তোমার জীবনের দ্বারদেশে তদনুরূপ সুখ বা দুঃখময় ফলটী হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সে ফল না খাইয়া তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। মহা তিক্ত হইলেও তাহার সবটুকুই তোমায় খাইতে হইবে। সে তোমারই স্বহস্ত-রোপিত কর্ম্মবৃক্ষের ফল। এবার না খাও, আবার আসিয়া খাইতে হইবে। কোন্ দিন যে কর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছিলে তাহা হয় ত তুমি ভুলিয়াছ, কিন্তু কর্ম্ম-দেবতার খুব স্মরণ আছে। তিনি পাকা ফলটী হাতে করিয়া আসিয়া তোমাকে খাওয়াইয়া দিবেন। আম, তেঁতুল, লঙ্কা, নিম, যে ফলই তোমার কর্ম্মবৃক্ষে ফলিয়াছে তার সবটুকুই তোমাকে খাওয়াইয়া দিবেন।

ব্যক্তিগত কর্ম্মফল সম্বন্ধে এই পরিষদে পূর্ব্বে একদিন আলোচনা করিয়াছি, আজ আর সে কথা তুলিবনা। যেমন ব্যক্তিগত কর্ম্মফল আছে, তেমন জাতিগত কর্ম্মফলও আছে। তাহা জাতির উপর দিয়াই ফলে। জগতের ইতিহাসে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আমি মাত্র আমার নিজ দেশের দশাটা যাহা দেখিতেছি, তাহারই একটু আভাস দিব।

সুদূর অতীতে যখন গ্রীক মাতৃগর্ভে, যখন কালডিয়া ও ইজিপ্ত শৈশবের ধূলিখেলায় ব্যস্ত, মানব-সভ্যতার সেই প্রভাত সময়ে যে

দেশ সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, যে দেশের তপোবনে ঋষিকণ্ঠে ত্যাগের মন্ত্র উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, যে দেশের ব্রাহ্মণগণ জগতের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষা-গুরু, যে দেশের শ্রমণগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে এসিয়া মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের জ্যোতিতে আলোকিত করিয়াছিলেন, সে দেশের আজ এ পতিত দশা কেন? উপনিষদ্, গীতা, ব্রহ্মসূত্র যে জাতির শাস্ত্র, ষড়্দর্শন যে জাতির মস্তিষ্কপ্রসূত, পিথাগোরস্ যে জাতির শিষ্য, সংস্কৃত যে জাতির ভাষা, সে জাতি কেন আজ ব্রাহ্মণহীন হইল? পাণিনির রক্ত যার শিরায় প্রবাহিত সে ব্রাহ্মণ সন্তানকে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের ভাষা শিখিবার জন্য আজ জর্ম্মনিতে যাইতে হয় কেন? চন্দ্র-সূর্য্যবংশ যে দেশের রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সে দেশ কেন ক্ষত্রিয়হীন হইল? কোহিনূর যে দেশের মাটীতে জন্মে, নদীর জলে যে দেশে স্বর্ণরেণু প্রবাহিত হয়, সাগর-গর্ভে যে দেশে মুক্তা ফলে, যে দেশের ধনে একদিন বিশ্বের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল, সে দিনও ইংরাজ কবি মিল্টন যে দেশের মণিমুক্তার গীত গাহিয়াছেন, জাপান হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত যে দেশের বাণিজ্যপোত সকল পৃথিবীর ধনরত্ন বহিয়া বেড়াইত, যে দেশের ধনপতি শ্রীমন্ত, চাঁদসদাগর প্রভৃতি আজও রূপকথার নায়ক হইয়া বিরাজ করিতেছে, সে দেশ কেন বৈশ্যহীন হইল? সব গিয়াছে, আছে শুধু দম্ভ। যদিও আমি

নিরক্ষর, যদিও পর-পদসেবা ভিন্ন জগতের আর কোন কাজই আমি পারি না, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, তথাপি আমার পদ-নখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত সব পবিত্র; কারণ, আমার অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ শাস্ত্র লিখিয়াছিলেন। যেখানে এত দম্ভ, এত অজ্ঞতা সে দেশ ও সে জাতি যে আজও টিকিয়া আছে, তাহা কেবল ঋষিদের পুণ্যফলে। কাল্‌ডিয়া গিয়াছে, আসিরিয়া গিয়াছে, ঈজিপ্ট গিয়াছে, গ্রীস গিয়াছে, রোম গিয়াছে,—হিন্দু মুমূর্ষু অবস্থায় আজও টিকিয়া আছে। কোন্ কর্ম্মের এ শুভ ফল? কোন্ তপস্যায় যুগান্তব্যাপী পরমায়ু পাওয়া যায়? এ কর্ম্ম, এ তপস্যা সেই ঋষিদের। তাঁহাদের পুণ্যফলে এখনও দেশে দুই একজন মহাপুরুষ সময় সময় জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু কালে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরায়। ঋষিদের পুণ্যফলেরও শেষ আছে। আমরা ভগবানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহারই রত্ন-বেদীর উপরে একটা ভাতের হাঁড়ি বসাইয়া নারায়ণ ভ্রমে তারই পূজা করিতেছি! নাস্তিকতা, নরহত্যা, ব্যভিচার, চৌর্য্য প্রভৃতি কিছুতেই আমাদের ধর্ম্ম লোপ হয় না, যতক্ষণ ঐ ভাতের হাঁড়িটা কেহ না ছোঁয়। যে দেশে বিশ্বামিত্র, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য এবং আরও কত কত প্রেমের অবতার মহাপুরুষগণ প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন সে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমাদের হাড়ে হাড়ে হিংসা ও ঘৃণা। মানুষকে মানুষ এত ঘৃণা আর কোন্ দেশে করে? মানুষকে আমরা

পশুপক্ষীরও অধম বলিয়া মনে করি। একটা বিড়াল বা কাক যদি আমাদের রান্না ঘরে যায় তবে আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা ভাতের হাঁড়ি অপবিত্র হন না, কিন্তু ব্রাহ্মণের রান্নাঘরে যদি অব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল, অমনি হাঁড়ি-দেবতা মারা গেলেন। এ দেশেই না নারায়ণ দেহ ধারণ করিয়া বানর রাক্ষসকে কোল দিয়াছিলেন, চণ্ডালের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন? নারায়ণ ত প্রেমময়। মানুষকে যে প্রেম দিতে না পারে, সে নারায়ণকে পূজা করিবে কিরূপে? যে মানুষকে ঘৃণা করে, সে ত নারায়নের শত্রু,—সে অসুর। আমাদেরই পুরাণে বহু অসুরের কথা আছে। তাহারা নারায়ণের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল এবং সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিল। নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারি, এত বড় অসুর আমরা আজও হই নাই। ইংরাজ ঔপন্যাসিক থ্যাকারে সংসারটাকে একখানা দর্পণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। দর্পণের কাছে ভ্রূভঙ্গি করিলে দর্পণস্থ প্রতিবিম্বও ভ্রূভঙ্গি করে, হাসিলে প্রতিবিম্বও হাসে। সেইরূপ সংসারকে ভ্রূকুটী করিলে সংসারও ভ্রূকুটি করে, হিংসা করিলে সংসারও হিংসা করে, ভালবাসিলে সংসারও ভালবাসে। আমরা আমাদের জাতীয় পবিত্রতার গৌরবে আজ বহুশতাব্দী ধরিয়া এতদূর ভ্রান্ত হইয়াছি যে, জগতের আর সকল জাতিকে অপবিত্র বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, অস্পৃশ্যজ্ঞানে তাহাদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছি। তা'ই

বিশ্ব-গুরুর বেত্রাঘাত নানা আকারে আজ আমাদের পিঠে পড়িতেছে। যাহাদিগকে অপবিত্র বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহারাই দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানেডা প্রভৃতি দেশে আজ ভারতবাসীকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেছে। তাহাকে শৃগাল-কুক্কুরেরই মত তাড়াইয়া দিতেছে! কিন্তু তথাপি উদরান্নের জন্য তাহাদের দ্বারে না গিয়া ভারতবাসীর উপায়ান্তর নাই। বিশ্বগুরুর এই বেত্রাঘাত আমাদের নিতান্তই প্রাপ্য, নচেৎ আমাদের চক্ষু ফুটিবে কেন? দুর্ব্বিনীত অবাধ্য ছাত্রের শাসন না হইলে পাঠশালা চলিবে কিরূপে? বিশ্বগুরুর যাহা সর্ব্ব শিক্ষার প্রধান শিক্ষা, সেই প্রেম যতদিন আমাদের সাধনার বিষয় না হইবে, যতদিন আমরা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানুষকে ভালবাসিতে না শিখিব, ততদিনই আমাদের জাতির পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত পড়িবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে দিন আমরা মানুষকে ভালবাসিতে শিখিব, যে দিন সর্ব্বভূতে আমাদের মৈত্রী হইবে, সে দিন এই যে বিভীষিকাময় বিশ্ববিদ্যালয়—ইহা আমাদের পক্ষে প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত হইবে; তখন দেখিব যে, এখানে বেত মোটেই নাই, কেবল আছে প্রেম ও আনন্দ; তখন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পার্শি—সকলে মিলিয়া এক মহাজাতি গঠিত হইবে; তখন আবার ঋষিরা আসিয়া এদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঘোষ।

শতাধিক বর্ষপূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের কথা উঠিলেই আমাদের মনে মার্কিণ দেশীয় দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের কথা মনে হয়। তদ্দেশীয় দাসত্ব-প্রথার নিবারণের জন্য যে আন্তর্জাতিক সমরানল প্রজ্জলিত ও যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই কথা মনে পড়ে। "পেনাল কোড্" বা দণ্ডবিধির কৃপায় আমাদের বালক ও যুবকগণ এ দেশে যে ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথা কখনও বর্ত্তমান ছিল তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। তাহারা চারিদিকেই "সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতা"র বিজয়-ডঙ্কার নিনাদ শুনিতে পায়, জাতিভেদের বৈষম্যটুকু সহ্য করিতে পারে না। "নিম্ন জাতির উন্নতির প্রচেষ্টা' "Depressed classes mission" ; "প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আবেদন" "শ্রমজীবিগণের সমবায়" প্রভৃতির কলরবে, সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের ধারা পর্য্যবেক্ষণ অনেক পরিমাণে দুরূহ হইয়া পড়ে।

ইতিহাস, সংস্কার-বিরোধী নহে, সংস্কারেরই পক্ষপাতী ; বরং

সংস্কারকগণ ইতিহাসের শিক্ষাকে অবহেলা ও পদদলিত করিয়া, সংস্কারকে সংহারের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে উপস্থিত করিয়া সংস্কারের পথে কণ্টক রোপণ করেন। ঐতিহাসিক ক্রমই সংস্কারের ও উন্নতির ক্রম; ইতিহাসের পথই ক্রম বিকাশ ও বিবর্ত্তনের পথ। সংস্কারের অন্য পথ নাই। সমাজের কোনও প্রথাই আকস্মিক বা ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রবর্ত্তিত বা পরিকল্পিত হয় নাই। প্রত্যেক প্রথাই মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কতকগুলি মূল-সত্য-প্রসূতা কারণ-শৃঙ্খলার ফলস্বরূপ। সেই শৃঙ্খলা স্ফুটভাবে দেখাইয়া দেওয়াই ঐতিহাসিকের কার্য্য। অতীতের ধারা নির্ণীত হইলেই, আমরা বর্ত্তমানকে ঠিক ধরিতে পারি ও ভবিষ্যতের গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিতে পারি; নচেৎ, গোলক-ধাঁধাঁয় পড়িয়া পথ হারাই।

দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। সমাজ-তত্ত্ববিদের "যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা"ও (Survival of the fittest) কিয়ৎ পরিমাণে সেই সবলেরই অত্যাচার। তবে, মানব-সমাজে পাশব বা দৈহিক বলই একমাত্র বল নয়; পরন্তু ইহা নিম্নশ্রেণীর বল। ধর্ম্মবল বা আধ্যাত্মিক বলই বল। যাহাকে আজ দুর্ব্বল বলিতেছি, মানব-সমাজে আধ্যাত্মিকতায় তাহাই সবল হয়।

সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সমাজের কোন না কোন স্তরে দাসত্ব-

প্রথার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে। ভূ-তত্ত্ববিদেরা যেমন ভূ-খণ্ডের স্তরে স্তরে ধরা হইতে বিলুপ্ত জীব-জন্তুর কঙ্কাল অথবা তরু-লতার প্রস্তরীভূত আকৃতি (Fossils) দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সেই সেই জীবজন্তুর ও তরুলতার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন, ঐতিহাসিকেরাও সেই প্রকার প্রাচীন গ্রন্থ, লিপি, প্রস্তর-ফলক, তাম্রফলক, ইত্যাদি দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের সামাজিক রীতি-নীতির অস্তিত্ব ও অভাব প্রতিপন্ন করেন।

আমাদের জাতিভেদ-প্রথার ভিতরেই যে দাসত্ব-প্রথার চিহ্ন বর্ত্তমান, প্রাচীন শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইয়া থাকে। নারদ-স্মৃতিতে আমরা পঞ্চদশ প্রকারের দাসের উল্লেখ পাই ;—

দাসঃ পঞ্চদশবিধঃ।

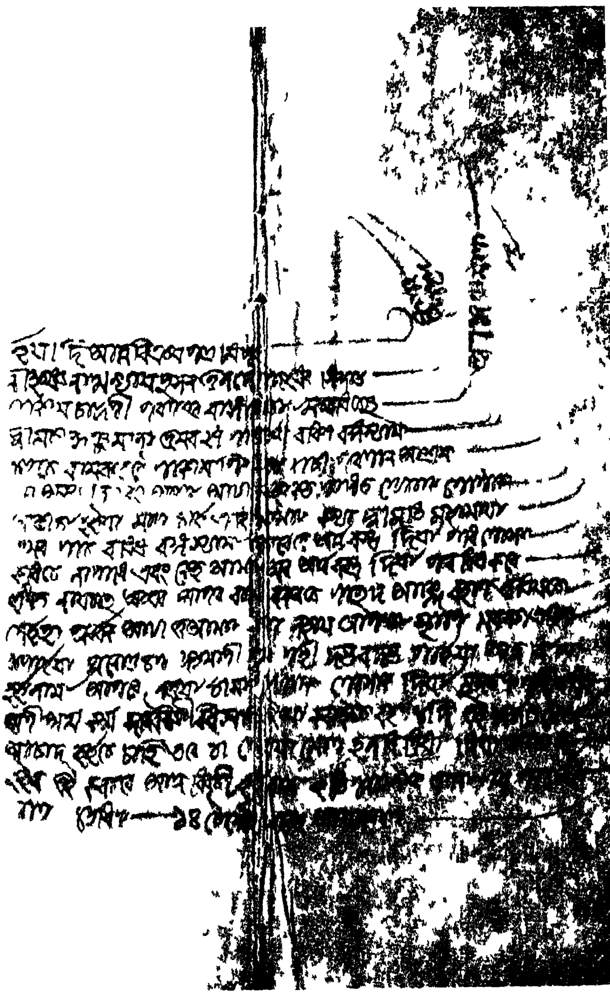
গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।
অন্নকাল ভৃতস্তদ্ব দাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ।
মোক্ষিতো মহতশ্চনাৎ যুদ্ধোপ্রাপ্তঃ পণেজিতঃ।
তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রব্রজ্যাবাসিতঃ কৃতঃ।
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয় স্তথৈব বড়য়া কৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃপঞ্চদশস্মৃতাঃ।

মহামতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার তাঁহার "দায়ক্রম-সংগ্রহে" উল্লিখিত স্মৃতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

"গৃহজাতো দাস্যামুৎপন্নঃ দারাদুপাগতঃ ক্রমাগতঃ অন্নকালভৃতঃ দুর্ভিক্ষ-পোষিতঃ স্বামিনাআহিতো বন্ধকীকৃতঃ, মোক্ষিতঃ,—ঋণমোচনেনাত্মনীকৃতদাস্তঃ তবাহামিত্যুপাগতঃ কন্যাপাদাসঃসন্ স্বয়ং দাসত্বেন সত্বরূপঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ সন্ন্যাসভ্রষ্টঃ কৃতঃ কেন চিন্নিমিত্তেন এতাবৎকালপর্য্যন্তং তাহংদাসঃ ইতি কৃতসময়ঃ ভক্তদাসঃ সুভিক্ষেঽপি ভক্তার্থমঙ্গীকৃতদাস্তঃ বড়বাকৃতঃ বড়বা দাসী তল্লোভাদহীকৃতদাস্তঃ।"

দাসত্ব-প্রথা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সে বিষয় আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্বেতকায় আর্য্যগণ যে কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অনেক সময় দাসে পরিণত করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। শূদ্রের এক আভিধানিক অর্থই দাস।

সম্প্রতি আমাদের শাখা-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রাই-চরণ গুহ বি, এল, তাঁহার গৃহে রক্ষিত কয়েকখানি প্রাচীন দলিল পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন। সেই দলীল কয়েকখানি পাঠ করিলে শত কি পাদাধিক শত-বর্ষ পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশের—বিশেষ বাখরগঞ্জের সামাজিক অবস্থার দু'একটি চিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত দলীলখানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, দাসত্ব-প্রথা বৈদিককাল হইতে প্রায় পেনালকোডের সময় পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, অথবা প্রচ্ছন্নভাবে জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।



আলোচ্য দলীলখানি ১১৯৫ সনের ১৪'ই অগ্রহায়ণের লিখিত। দলীলখানি এই :—

ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম চান্দশী পরগণে বাঙ্গরোড়া সুচরিতেষু :—শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইশ ব রষ রঙ্গস্যাম জওজে রাম রুদ্রতৈ সাকিন পিঙ্গলাকাঠী পরগণে আজীমপুর অস্য লিখনং আগে আমী মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোষাক আজিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রঙ্গস্যাম এহার ও অন্ন বস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্ন বস্ত্র দিয়া পর-বিষ করে এমত না যাছে অতএব আপন রাজিরকষাতে সচ্ছেন্দ আক্রে-বহাল তবিয়তে সেই ইচ্ছা পূর্ব্বক আমি ও আমার কন্যা যাহায় আপনার স্থানে মবলগ ৩ তিন রুপাইয়া পুরোওজন দহমাসী চলন সহী দস্তবদস্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত ৭০ সত্র বরিষ দাসী অর্থ কর্ম্ম দানবিক্রীরধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈর্দ্দে আচাদ হইতে চাহি তবে ১০ সোয়ামণ হলধি সিধা দিয়া আচদ হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পাচানবৈ শাল তেরিখ ১৪ চৈদ্দহী মাহে অগ্রহায়ণ।

ইহা পাঠ করিলে তৎকালিক ভাষা, লিখন-প্রণালী, দেশের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

স্মৃতি-কথিত পঞ্চদশ প্রকারের দাসের মধ্যে আত্ম ও সন্তান-বিক্রয় দ্বারা দাসত্ব-অঙ্গীকারের প্রথা প্রতিপন্ন হইতেছে।

কুঞ্জমালা সধবা কি বিধবা তাহা প্রকাশ নাই; সম্ভবতঃ বিধবা। যদিও দলীলে জওজে মৃত লেখা হয় নাই তথাপি লিখন-ভঙ্গীতে বিধবা বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সংসারে তাহাকে অন্ন-বস্ত্র দিয়া রক্ষা করে, কি ভরণপোষণ করে এমন কেহ নাই। দারিদ্র্যনিবন্ধন তিনটী টাকা পাইয়া, সপ্তমবর্ষীয়া কন্যাসহ আত্ম-বিক্রীতা হইল। সত্তর বৎসরের জন্য আত্মবিক্রয়, তখন তাহার বয়স ২৭ সাতাইশ বৎসর, সুতরাং এই আত্মবিক্রয় চিরকালের তরেই বুঝিতে হইবে। "সোয়ামণ হল্‌দি সিধা" দিয়া মোচন হওয়ার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা যে কখনও কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে এরূপ মনে করা যায় না। আর সোয়ামণ হলুদের ব্যবস্থাই বা কেন? হলুদ কি তখন দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য ছিল, না, বর্ণের সাম্যবশতঃ যেমন স্বর্ণের স্থানে অনেক ব্যাপারে হলুদের প্রতিনিধিত্বই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তদ্রূপ এস্থলেও হলুদের ব্যবস্থা? কুঞ্জমালা ও তাহার কন্যা মহামায়া যে কখনও স্বাধীনতালাভ করিয়াছিল বা পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে কি যে ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, সঙ্গীয় অপর একখানা দলীল-পাঠে দেখা যায়,—কুঞ্জমালার এক "ভাসুর" রামরামতৈ জীবিত ছিল, এবং এই আত্ম-বিক্রয়ে তাহার সম্মতি ছিল।

ব্রাহ্মণ

বাংশুরনাথ রায় শুক্র
সাকিম চন্দদি [illegible]
শ্রীরাম দলাধণ সাকিম বাউবেড়ে
পরগনে বাগেরাজ এক দিমন আমিন
বাসকি শঙ্কুমণ্ডল জমাতে রাম কবরও সহিল
লিপিকা ফর্দ পরগনে ভাতিকে স্বপরাতকের
খোদা বাসাতি মন্দমাথা এবং গুঞ্জা সেহরা [illegible]
ওপরাবে সনে আন্ত বিকী হর্ল এহের মধ্যে [illegible]
পালী পালসিংহ দিনাম এহের ভাস্কর বসরাম বায় ও
শ্যামা [illegible] ২ দুই তঙ্কা পাসা কিনসে হারি শরমা
[illegible] লিখে সাক্ষী প্রদি নাম যাহা দিতে
পারেন তবে এহ চৌদ্দ কিছু [illegible]
হইবে তাহার পিসা আমি দিব ইতি বাসাইs
[illegible] — ২৪ বৈশাখ —

সেই দলীলখানা এই :—

শ্রীদুর্গাঃ—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ—
সাকিম চান্দসি সুচরিতেষু—
শ্রীরামদাস দাস সাকিম বট্যোযোড়—
পরগণে বাঙ্গরোড়া অস্য লিখনং আগে

নিশানসই
শ্রীরামদাস দাস

শ্রীমতী কুঞ্জমালা জওজে রামরুদ্রতৈ সাকিন পিপীলাকাঠী পরগণে আজিমপুর এবং ওহার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া এই দুইজন সেইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার স্থানে আত্তবিক্রী হইল এহার দুর দুইজনকে আমী আনিয়া দিলাম এহার ভাসুর শ্রীরাম রামতৈ ইসাদী করেন, দুই তঙ্কা আমি নিলাম এহার নাম কওলায় লিখাইয়া দিব যদি না লিখাইয়া দিতে পারি তবে এই জেন্সে কিছু খেসারত আপনার হয়ে তাহার নিসা আমি করিব ইতি সন ১১৯৫ তেরিখ ১৪ অগ্রহায়ণ।”

এইটি দলিলের রসীদ, কুঞ্জমালা যে তিনটাকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইতেই কি এই দালাল দুই টাকা পাইল! তবে আর এই রসীদের প্রয়োজন কি ছিল? অথচ কুঞ্জমালা এই বয়ায়ের তিনটি টাকার কি ব্যবহার করিল তাহা বুঝা যাইতেছে না।

এই স্বীকার-পত্রী বা রসিদ-পাঠে ইহাও বুঝা যায় যে, এই প্রকার আত্ম-বিক্রয়, বা দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল; সমাজে ঘৃণিত হইবার বা রাজদ্বারে কি ধর্ম্মাধি-

করণে দণ্ডের আশঙ্কা থাকিলে এই প্রকার দলীল-সম্পাদন সম্ভবপর হইত না। তবে, দালালি বা আড়কাঠির কৃপায় কোন রমণী কাহারও গৃহে দাস-বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইলে পরে যদি তাহার আত্মীয় কেহ অভিভাবকস্বরূপে সেই রমণীর উদ্ধারের জন্য রাজদ্বারে বা সমাজে প্রার্থী হইত তবে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে হইত। নচেৎ ক্রেতা ন্যায়ভূষণ মহাশয় কুঞ্জ-মালার ভাসুর রামরামতৈর সম্মতির জন্য এত ব্যগ্র হইবেন কেন? এবং দালাল রামরাম দাসই বা কেন "খেসারত নিশা" করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে?

খৃঃ ১৮৩০ অব্দে দণ্ডবিধি বিধিবদ্ধ হয়, দণ্ডবিধির পূর্ব্বে এই প্রথা অব্যাহতভাবে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্যদেশের দাসত্ব ও আলোচ্য কালে এ দেশের দাসত্ব-প্রথার বিলক্ষণ পার্থক্য আছে।

A slave is a creature without any right or status whatever, who is, or may become, the property of another as a mere chattel, the owner having absolute power of disposal by sale, gift or otherwise over the slave without being responsible to any legal authority. In *the east there is a modified kind of slavery*, for children are purchased from their parents or strangers and are

brought up as domestic servants, having little or no personal liberty conceded to them and though they are not ordinarily sold, yet they are transferred from one member of a family to another, by way of gift.

(Sec. 370l. P. C. 39 and 40 Vide. Ch. 46.

পাশ্চাত্য দেশে দাসের সংজ্ঞা এই :—

দাসের কোন প্রকারের স্বত্ব বা অধিকার নাই, জড়পদার্থ ও পশ্বাদির ন্যায় দাস স্বামীর সম্পত্তি। স্বামীর ইচ্ছানুসারে দাস দান-বিক্রয় ইত্যাদি দ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে, এবং এক সময়ে স্বামী তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন (এক সময়ে দাসকে হত্যা করিলেও স্বামী রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত না)।

প্রাচ্যে দাসত্বের আকৃতি অন্য প্রকারের। পিতামাতা কি অপর কোন ব্যক্তি হইতে শিশু ক্রীত হইয়া গৃহকার্য্যে নিয়োজিত হইত, এবং ক্রীত ব্যক্তিদিগের কোন প্রকারের স্বাধীনতা ছিল না। যদিও সচরাচর দাস-দাসী বিক্রয় হইত না, কিন্তু পরিবারস্থ এক ব্যক্তি অপরকে কি আত্মীয়-স্বজনকে দাস-দাসী দান করিতে পারিত। দণ্ডবিধি আইনের ৩৭০ ধারার নিয়ম এই :—

Whoever imports, exports, removes, buys, sells

or disposes of any person as a slave or accepts, receives or detains against his will any person as a slave, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

"যে ব্যক্তি অপর কাহাকেও দাসস্বরূপে আমদানী, রপ্তানি, স্থানান্তর, ক্রয়-বিক্রয় অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করে অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকে দাসস্বরূপে গ্রহণ বা আবদ্ধ করে, তাহার ৭ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কি বিনাশ্রমে কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

এই বিধানই অস্মদ্দেশে দাসত্ব-প্রথার মূলোৎপাটন জন্য বিহিত হইয়াছিল।

বিশ্বপ্রেমিক টমাস্ ক্লার্কসন ও উইলিয়াম উইলবারফোর্ডের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ১৭৮৭ খৃঃ-অব্দে দাস-ব্যবসায় নিবারণ জন্য এক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রায় বিশ বৎসর পরে উক্ত মহানুভবদিগের আন্দোলনে ও চেষ্টায় ১৮০৭ খৃঃ-অব্দে পার্লামেণ্টে দাস-ব্যবসায় রহিত করার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। সুসভ্য স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ডেই বিশ বৎসরের আন্দোলনে, এই জঘন্য দাস-ব্যবসায় ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে রহিত হইল; আর এই দেশে এবম্বিধ কুপ্রথা নিবারণ জন্য কত বৎসরের আন্দোলন প্রয়োজন, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

শতাধিক বর্ষপূর্ব্বে

তারপর, ক্রীতদাসগণকে স্বাধীনতা-প্রদানের চেষ্টা। কেবল সেইদিন অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃঃ-অব্দে "মুক্তি আইন" (Emancipation Act) দ্বারা ব্রিটিস সাম্রাজ্যের দাসগণ স্বাধীনতা লাভ করে, এবং দাসস্বামীদিগকে ২০,০০০,০০০, পাউণ্ড মুদ্রা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ

(জীবন-কথা)

সে আজ বহু বর্ষের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রীর বিবাহোপলক্ষে জোড়াশাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে আমি কবি দ্বিজেন্দ্র-লালকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করি। যতদূর স্মরণ হয়—সে দিন সে গৃহে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র, কবিবর রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাহিত্য-রসজ্ঞ ব্যক্তি ফরাসের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-স্রোতে সেদিন হাস্য-লহরীর যে বিচিত্র-মোহন লীলা-বিভঙ্গ লক্ষ্য করিয়া-ছিলাম তাহা এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারি নাই, বুঝি পারিব-ও না। "নন্দলালে"র স্বদেশপ্রীতি হইতে আরম্ভ করিয়া, "কিন্তু"-পরাহত "হ'তে পার্‌তাম" দলের বিচিত্র কাহিনী তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে গায়িতে-ছিলেন; আর, ফরাসের উপরে ভারতের শিরোভূষণগুলি সরল হাস্য-বিভায় গৃহতল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিলেন। কেবলমাত্র কর-স্পর্শ সুখে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়াই সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম! ইহার অনেক পরে এক দিন কবি প্রমথনাথের সঙ্গে কলিকাতার ঝামা-পুকুরে একটি ক্ষুদ্র আলয়ে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমি প্রথম

সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কবি-সন্দর্শনে ও তাঁহার সহিত সরস আলাপনে সেই অম্লান প্রভাতে আমার যে কত আনন্দই হইয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝান অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দিন আমাকে—সেই প্রথম—তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি উপহার দিলেন। আমি সেই 'সাদরোপহার' প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম।

প্রথম হইতেই দ্বিজেন্দ্র লালের অকৃত্রিম, কাপট্যলেশহীন ব্যবহারে আমি বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সামাজিক লৌকিকতাশূন্য কবির হৃদয়-ক্ষেত্রে একেবারে অসঙ্কোচেই আমি প্রবেশলাভ করিলাম। এ জীবনে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কত শত গণ্য ও নগণ্য ব্যক্তির সংসর্গে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু, এমন শিশুসুলভ সারল্য, বড় কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সারল্য ও বন্ধুবাৎসল্য

প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই উদার-মতি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইল। বেশ মনে পড়ে —তৎকালে প্রকাশিত, তাঁহার "তারাবাই" নাট্য-কাব্যের আমি একটি সমালোচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে সমালোচনাতে প্রচুর পরিমাণে আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন সন্ধ্যাকালে আমার নিকট আসিয়া সহসা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন,

এবং আমার প্রদর্শিত ত্রুটিগুলি অম্লান বদনেই স্বীকার করিয়া অপ্রত্যাশিত প্রীতির সুখ-বেদনায় আমাকে "ভাই ভাই" বলিয়া কতই না কাঁদাইয়াছিলেন! দ্বিজেন্দ্রলালের বিনয়বর্জ্জিত ব্যবহারের অন্তরালে যে বিরাট্ হৃদয় ছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন তাঁহারা এ কথা আজ অকপটেই স্বীকার করিবেন যে, অমন শিশুর ন্যায় সরল ও কোমল, আকাশের ন্যায় প্রশান্ত ও উদার, মেঘের ন্যায় গম্ভীর ও অমিয়বর্ষী হৃদয় এ সংসারে বস্তুতই পরম দুর্লভ সামগ্রী। অপ্রতিহত নির্ভীকতা ও সারল্য-সঞ্জাত, স্বভাব-সুলভ স্পষ্টবাদিতার দরুণ যাঁহারা দ্বিজেন্দ্র-লালকে 'অহঙ্কারী' 'দাম্ভিক' প্রভৃতি আখ্যায় লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন তাঁহাদেরি অবগতির উদ্দেশ্যে আমি এই ব্যক্তিগত ঘটনাটির উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিলাম। আত্ম-প্রত্যয় ব্যতীত এ সংসারে কেহ কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলালেরো আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস চিরদিনি সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। যে অদম্য প্রতিভার অপার্থিব প্রভাবে আজ এই হতভাগ্য বঙ্গভূমি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে সে দিব্যশক্তির স্পন্দন দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন, এবং অত্যধিক সারল্য বশতঃ অনেক সময়ে তাঁহার সে বিশ্বাস দম্ভ বা অহঙ্কারের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের মহান্ চরিত্রের এই নিগূঢ় সত্যটুকু

সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে যাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই তাঁহারাই তাঁহাকে অসামাজিক ও অহঙ্কারী প্রভৃতি বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না।

পত্নী-বিয়োগ ও সংযম।

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহধর্ম্মিণী একটি বালক ও এক শিশু কন্যার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া সহসা পরলোক-প্রয়াণ করেন। দলে দলে দ্বিজেন্দ্রলালের গুণমুগ্ধ কত ব্যক্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা দান করিবার প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু, অতুল প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল সান্ত্বনা দানের ব্যর্থ চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অনেক সময়ে একান্তই অশোভনভাবে বাক্যালাপ করিতে থাকিতেন; কখন বা সঙ্গীত-সুধায় অভিনন্দিত করিয়া সকলকে বিদায় দিতেন। এই সময়ে একদা দ্বিপ্রহরে একাকী পাইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'আপনি এমন করিয়া এ সময়ে কি করিয়া অত হাস্যালাপ করেন, বুঝিতে পারি না।' তদুত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল গলদশ্রু-লোচনে আমাকে বলিয়াছিলেন—"সবি পারি; কিন্তু তার প্রসঙ্গ বা এই সকল নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট, মৌখিক সান্ত্বনা আমার সহ্য হয় না। সে যে আমার কি ছিল, তোমরা কি বুঝ্‌বে!" এই বলিয়া কবিবর পুত্র-কন্যা দু'টির দু'হাত ধরিয়া গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার অর্গল-রুদ্ধ করিলেন। আমি একাকী কিছুক্ষণ সেই শূন্য গৃহতলে অপেক্ষা

করিয়া, সেই মহাজনের অতুল প্রণয়ের অপরিমেয় গভীরতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম। বলা বাহুল্য—পত্নীহারা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার লোকান্তরিতা, প্রেমময়ী দেবীর সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত শুনিতে বা বলিতে পারিতেন না। বহু প্রলোভন ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম কি প্রকার নিবিড় ও অচপল ছিল তাহা 'আলেখ্য' কাব্যের "বিপত্নীক" "মাতৃহারা" "বিধবা" ও "হতভাগ্য" কবিতাগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন। একবার মনে পড়ে,—তাঁহার দ্বিতীয়-বার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় তিনি আমাকে ভয় দেখাই-বার ছলে লিখিয়াছিলেন—"আমি তো আবার বিবাহ করিতেছি। বেশ কথা,—না?" আমি তদুত্তরে তাঁহার সে কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া, যখন প্রকৃত ঘটনা কি জানিতে চাহিয়াছিলাম তখন প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে জানাইয়াছিলেন,—"বিবাহ সম্বন্ধে তোমার ধারণাই ঠিক। কাম-পরিণয় সমাজের দিক্ দিয়ে সমর্থিত হ'লেও হৃদয় তা'তে বাধা দেয়। সমাজকে জীবনে অনেক ঠকিয়েছি; কিন্তু, নিজেকে—হৃদয়কে ঠকিয়ে কেমন করে' বাঁচ্‌ব ভাই? 'বিয়ে লোকের আর ক'বার হয়'—এ তোমার লাখ্ কথার এক কথা।" দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করিলেন না। চিরজীবন অসীম সংযমে তিনি মোটা কাপড় ও সাধাসিধা 'চাল'-ই বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

জীবন—আদর্শ বিপত্নীক জীবনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কেহ তৈল বা সাবান ব্যবহার করিতে দেখে নাই। রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, নগ্ন গাত্র, নগ্ন পদ, বিলাত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বাড়ীতে "দুপ্ দুপ্" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন —আজো সে দৃশ্য যেন স্পষ্টই চোখে দেখিতে পাইতেছি। তিনি যে শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে ;— বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্রলাল আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায় যথার্থ বিধবারি ন্যায় অসীম সংযম—অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর গলিতে কবিবর প্রাসাদ-সদৃশ সুদৃশ্য, এক দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া, সে ভবনের নাম রাখিয়াছিলেন—'সুর-ধাম'। আমি সে নামের সার্থকতা না বুঝিয়া, একদিন এই কবিত্বহীন নামকরণ লইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে, আমার নিকটে আসিয়া, কবিবর জনান্তিকে বলিলেন—"জান না ? এ বাড়ী যে, তাহার। আমি এখানে তাহারি স্মৃতির অন্তরালে ডুবিয়া থাকিব। তারি নাম ছিল—সুরবালা!" রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইলে আমি এ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার দরুণ প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। তখন, কেন জানি না, সীতা-বিরহিত রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আমার মনে পড়িয়াছিল।

সংসারের নানা কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াও তিনি নিতান্ত নির্লিপ্তের

ন্যায়—'আলু-থালু' ভাবে—সন্ন্যাসীরি মত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। লোকনিন্দা-নিরপেক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনে কখনো কাহারো মুখাপেক্ষী হন নাই। ভ্রষ্ট-চরিত্র লোকের মধ্যে গুণের সন্ধান পাইলে তিনি তাহার সহিত অসঙ্কোচে মিশিয়াছেন।—আগুন লইয়াও তাঁহাকে খেলা করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু, কখনো হাত পোড়ান নাই। শত বাসনার বিবিধ ও বিচিত্র প্রলোভন অতি সহজেই উপেক্ষা করিয়া,—

প্রলোভন হ'তে দূরে, বিজনে, অরণ্য-কোণে,
যোগী কি বৈরাগী
সংবরিতে আত্ম-মন, যে সাধন-সিদ্ধিতরে
নিত্য রহে জাগি'—

তিনি সে সাধনে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালকে একদিন "নীতিবাদী" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে সাহস করিয়াছিলেন, নিষ্প্রয়োজন হইলেও, আমি তাঁহাদেরি অবগতির জন্য এই কথাটার আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলাম।

স্বদেশ-প্রেম।

আর একদিনের একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তখন কবিবর ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। রবিবার। প্রাতঃকালে আমরা অনেকে তাঁহার বসিবার ঘরে গল্প-গুজব করিতেছি; সহসা দূর হইতে একটা সুর

আমাদের কাণে ভাসিয়া আসিল। তখন স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ পরিপ্লাবিত ;—ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, নগরে, প্রান্তরে, সর্ব্বত্রই—নব-জীবনের বিপুল বন্যা অপ্রতিহত প্রভাবে বহমান। আমরা তড়িৎবেগে সে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম—কতকগুলি যুবক দল-বদ্ধ হইয়া মাতৃনাম গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন, সঙ্গে শত শত লোক মন্ত্র-মোহিত চিত্তে সে সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ-সমক্ষে আসিয়া সেই বিপুল জন-স্রোত সহসা সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন সেই ভাব-তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন, এবং উর্দ্ধবাহু হইয়া তিন চার বার জলদ-নির্ঘোষে "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রে গগন প্লাবিত করিয়া দিলেন। সেইদিন তাঁহার রক্তিম মুখ-মণ্ডলে ভাবসমারোহের যে জ্বলন্ত জ্যোতির্ব্বিভা দেখিয়াছিলাম তাহা এ দগ্ধ হৃদয়-পটে চির-জীবন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া মাতৃ-ভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল যে সঙ্গীত ও যে মন্ত্র বারংবার গাহিয়া উঠিয়া-ছিলেন, আজ এ হতভাগ্য দেশ সে গান আর শুনিতে পাইবে না;—আজ সে গভীর-গম্ভীর স্বর-তরঙ্গ একেবারেই অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় পত্রে আমাকে একদিন কবিবর বলিয়াছিলেন—"এ দেশ আজ যদি পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত কল্যাণ-সাধনে তৎপর হয়, তবে

এ জগতে এমন কোনও শক্তিই নাই যে, তাহার সে বল-দৃপ্ত গতির রোধ করিতে পারে। কিন্তু অযথা এ অশোভন আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু—যাহাদের কৃপায় ও পুণ্যবলে আমাদের আজ এই যা'-কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে—তাহাদের প্রতি আমাদের এ অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের উদ্ধারের কোনও উপায়ই আমি দেখি না।" আজ দূরদর্শী, রাজনীতিক দ্বিজেন্দ্রলালের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমার মানস-শ্রবণে এখনো ঝঙ্কৃত হইতেছে। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল "প্রতাপসিংহ" নাটক প্রকাশিত করেন, এবং ভারত-গৌরব দুর্গাদাসের অমূল্য জীবন অবলম্বনে নাটকপ্রণয়নে রত হন। দুর্গাদাসের অনিন্দ্য, আদর্শ চরিত যাঁহারা রাজস্থানে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কবিবরের "দুর্গাদাস" পাঠ করিলে বুঝিবেন,—যোগ্য কবির হাতে সে চিত্র কিরূপ বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কি ব্যক্তিগত জীবনের আচার-ব্যবহারে—কি সাহিত্য-সাধনার অবকাশে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত কল্যাণকল্পে যে অনুপম সাহস ও অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ দেশে যদি কখনো যথার্থ স্বাস্থ্য সঞ্চারিত হয়, তবে সেইদিন দেশবাসী সকলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে, নেত্র-জলে এই স্বদেশ-প্রাণ কর্ম্মবীরকে অকৃত্রিম প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

সেবা

একবার পূজাবকাশে আমি গয়ায় গিয়া কয়েকদিন আমার নমস্য ও প্রাণ-প্রিয় সুহৃত্তমের অতিথি হইয়াছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালে গয়ার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। এই সময়ে এই অযোগ্য লেখক সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত একত্র বসবাস করিবার শুভ অবসর পাইয়াছিল। একদিন দুপুরবেলা আহারান্তে বসিয়া আছি; কবিবর বলিলেন—"দেখ, আমার মাথায় একটা গানের কতকগুলো লাইন আসিয়া ভারি জ্বালাতন করিতেছে। তুমি একটু বোসো;—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।" অর্দ্ধঘণ্টা বা তাহারো কিছু অধিক কাল একাকী বসিয়া রহিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল দূর হইতে করতালি দিয়া, গায়িতে গায়িতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া কহিলেন,—"উঃ! কি চমৎকার গানি লিখেছি। শুন্‌বে? শুন্‌বে না কি? আচ্ছা, তবে শোন"—এই বলিয়া, গায়িয়া উঠিলেন,—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ!"

গানটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম; তখন, বলিতে লজ্জা হয়—পাষণ্ড আমি, আমারো চক্ষে জল আসিয়াছিল; তখন নীরবে, নতশিরে একটা অপার্থিব অনুভূতির আবেগে ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বন্ধুবর বলিলেন—"কি? কেমন লাগল?"

আমি বলিলাম—"ধন্য আপনি!" বাল-স্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল একবার, শুধু একবার আমার মুখের দিকে হাসিয়া চাহিলেন; পরে আর কিছু না কহিয়া, হাতে তাল দিতে দিতে, ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া গায়িলেন—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা,
কিসের ক্লেশ?
সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন
আমার দেশ!"

সে রাত্রে যথারীতি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের আবাসে আসিয়া এই অগ্নি-গর্ভ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া উৎসাহে, গর্ব্বে, আনন্দে, বিস্ময়ে ও ভক্তির প্রাবল্যে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন! শ্রীযুক্ত লোকেন পালিত মহাশয় তৎকালে গয়ার জজ ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে বন্ধু-বৎসল পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্র-লালের গৃহে আসিতেন, এবং সাহিত্যিক বিতর্ক-বিচারে রাত্রি প্রায় একটা দুইটা পর্য্যন্ত যাপন করিতেন। "আমার দেশ" গানটি শুনিয়া লোকেন্দ্রনাথের যে অপূর্ব্ব উৎসাহ দেখিয়াছিলাম তাহা এ জীবনে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক "নূরজাহান" মুদ্রিত করিয়া "মেবার-পতনের" রচনায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। মেবারের গৌরব-ভাস্কর যখন ভারতাম্বরে প্রদীপ্ত, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর

যখন সে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ-তাপে প্রপীড়িত ও ম্রিয়মাণ—রাজপুত-শৌর্য্যের সেই সৌভাগ্য দিনে মেবারের মহিমা ও গর্ব্বের স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবি "মেবার পাহাড়, উড়িছে যাহার রক্ত-পতাকা উর্দ্ধশির" ইত্যাদি যে গানটি লেখেন, এই হতভাগ্য তখন তাঁহারি পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। সঙ্গীতটি গ্রথিত হইলে আমি মেবারের পতন বিষয়ে আর একটি যোগ্য গান রচনা করিতে বলিলাম। সেইদিনি সন্ধ্যার সময়ে আর একটি গান লিখিত হইল—

"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার
রক্ত নিশান ওড়ে না আর,"—

সুর-সংযোগ করিয়া সঙ্গীত দুইটি আমায় গাইয়া শুনাইলেন। আর এ জীবনে সে কণ্ঠ শুনিব না!—বুঝি তেমন গানো আর রচিত হইবে না। হা—ভগবান!

এই সময়ে কোনও সুবিখ্যাত কবি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সরকারী কোনো কার্য্যোপলক্ষে গয়ায় আসিয়া কতিপয় দিবস দ্বিজেন্দ্র-সহবাসী হইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহারা ও লোকেন্দ্র পালিত মহোদয়ের অনুরোধক্রমে বন্ধু আমার এই তিনটি গান গায়িয়া শুনাইতেছিলেন, বিমুগ্ধ শ্রোতা আমরা সে অতুল সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দে, বিস্ময়ে ও দেশভক্তিতে সত্য সত্যই অভিষিক্ত হইয়া গিয়াছিলাম। সে নিশায় ক্ষণজন্মা দ্বিজেন্দ্রলালের যে দুর্দ্দম উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, এ জীবনে তাহা কি কখনো ভুলিবার!

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রীতির অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনা আমার এস্মৃতি-পটে আজো সুস্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে ; বিধাতা যদি দিন দেন তবে সে সকল কথা পরে বলিব।

কবিবরের "প্রতাপ-সিংহ," "দুর্গাদাস" ও "মেবার-পতন" যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহারাই কবির ঐকান্তিক স্বদেশ-প্রেমের—বিশ্ব-প্রেমের পুণ্য-প্লাবনে পরিপ্লুত ও প্রবুদ্ধ হইতে পারিবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার 'আমার দেশ', 'আমার জন্মভূমি' ও 'আমার ভাষা' বঙ্গদেশের অবিনশ্বর, অমূল্য সম্পৎ।

নৈতিক বল ও সমাজ-সংস্কার।

দেশ-প্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজ-সংস্কারের একান্ত অভিলাষী ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-পালনের পরম পক্ষপাতী হইয়া এবং নিজের জীবনে এক হিসাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়াও তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিধবাবিবাহের পক্ষাবলম্বীই ছিলেন। বিলাত-প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলাল বিনাপরাধে, অকারণে হিন্দুসমাজের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত না হওয়ায়, আমি যতদূর জানি—গোঁড়া হিন্দুসমাজ কর্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেও, তিনি কিন্তু আমরণ হিন্দুসমাজের শুভাকাঙ্ক্ষাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। অবস্থা-বিশেষে বিধবাবিবাহ সমাজের দিক্

দিয়া সমর্থনযোগ্য—স্বীকার করিতেন; কিন্তু, কি বিধবা কি বিপত্নীক—উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য-পালনই যে সম্পূর্ণ বিহিত তা' তিনি বারংবারই বলিয়া গিয়াছেন।

আহার সম্পর্কে জাতিবিচার, তিনি সমাজের পক্ষে শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে—অবশ্য-পরিত্যাজ্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিলোপ সাধন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। জাতি বা বর্ণ-নির্ব্বিচারে বিবাহাদির অনুষ্ঠান, তিনি আবশ্যক বা সমাজের পক্ষে হিতকর মনে করেন নাই। কিন্তু, স্পর্শদোষ বা টিকির মাহাত্ম্য তিনি আদৌ মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি স্বীয় পুত্র, পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দিলীপকুমারের যথারীতি উপনয়ন-সংস্কার করিয়াছিলেন, এবং আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, —"রক্ত-সংমিশ্রণের আমি কোনো আবশ্যকতা বা উপকারিতা বুঝ্‌তে পারি না।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুপাত্রের অভাব না ঘটিলেও, অদ্যাপি তিনি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা, কল্যাণীয়া শ্রীমতী মায়া দেবীর বিবাহ দিয়া যান নাই। বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না বটে; কিন্তু, দস্তুরমত 'কোর্ট-সিপ' প্রচলিত হওয়ার বিপক্ষেই তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাকে একদিন প্রসঙ্গচ্ছলে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"প্রাপ্তযৌবন পুত্র-কন্যা অনেক সময়ে, বয়সের দোষে নিজেদের ভবিষ্যৎ বুঝিয়া, বিবাহ-ব্যাপারে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে; এ সম্বন্ধে পিতামাতার ন্যায় তাহাদের যথার্থ হিতার্থী এ-সংসারে আর কেহই নাই,—তাহারা নিজেরাও নহে।" নিপুণ তার্কিক দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত যথারীতি এ সম্পর্কেও আমার বহুবার বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল।

পণগ্রাহী, লোভ-পরায়ণ পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের প্রসঙ্গ উঠিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"পণ-গ্রহণ আমি অন্যায় মনে করি না। যে দেশে বাল-বিধবা, ব্রহ্মচারিণী দেবীর অভাব নাই সে দেশে যোগ্য পণ দানে অক্ষম, দরিদ্র পিতার কুমারী কন্যা কেন যে দু'চার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌তে পার্‌বে না, বোঝা যায় না। পিতার পক্ষে পুত্র ও কন্যা কেহই কম আদরণীয় নয়। কন্যাকে জন্মের শোধ ফাঁকি দিয়ে পুত্রের জন্য সর্ব্বস্ব রক্ষা করা, আমি গর্হিত ও অন্যায় মনে করি। কন্যাটির আজীবন ভরণ-পোষণের ভার যে লইবে সে কেন যে ন্যায়ত পণ-গ্রহণ কর্‌বে না, বুঝে ওঠা দুষ্কর।—এ দেশে এ প্রথা আজ নূতন নহে, এবং বিলাতে স্বেচ্ছা-প্রণয় প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, সেখানেও এই Dower system—পণ-প্রথা যে নাই, এমন কথা কেহই ব'ল্‌বেন না।" সমাজে বয়স্থা কন্যা গৃহে রাখিলে লোকে নিন্দা করে বলিলে, তিনি শুদ্ধ তাঁহার স্বভাব-

সুলভ ব্যঙ্গহাস্য করিতেন ও বলিতেন—"লোক-নিন্দা! আগে সমাজের জন-সাধারণ শিক্ষিত হোক্; তারপর, তাদের নিন্দায় কর্ণপাত করা যাবে।"

আমি মনস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের কোন মত এ স্থলে সমর্থন করিতে আসি নাই। তবে, এইটুকুই আমার কথা যে, লোকাপবাদ বা সমাজের ভয়ে তিনি কখনো নিজের Principle বা মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। জীবনে যাহা জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে তিনি সত্য শুভ, ও সুন্দর বলিয়া জানিয়াছেন, স্বীয় সাধ্যানুসারে, তাহাই তিনি সম্পন্ন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করিতেন না।

আমরা অতি সংক্ষেপে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের ক'একটা দিক মাত্র স্পর্শ করিয়া গিয়াছি। এখন তাঁহার পবিত্র জীবনের আর একটি প্রধান বিশেষত্বের বিষয় আপনাদিগকে জানাইব।

স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা-প্রীতি

দ্বিজেন্দ্রলাল কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, পাশ করিয়া বিলাত গমন করেন, এবং সেখানে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সামান্য ডেপুটির কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সমসাময়িক সহযাত্রী ও সতীর্থগণের মধ্যে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, মাননীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর নাম আজ সকলেই অবগত আছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অপেক্ষা শিক্ষা ও জ্ঞানে হীন

না হইলেও, গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করায়, আজীবন দৈব-বিড়ম্বনা বশতঃ, তিনি সামান্য ডেপুটিত্বই করিয়া গেলেন। আর, আজ স্বাধীনজীবী আশুতোষ ও ব্যোমকেশ বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অতুল সম্মানের অধিকারী হইয়া দেশের ও দশের নেতৃপদবাচ্য হইয়া রহিয়াছেন। ডেপুটিদের মধ্যেও অনেকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্যও ঘটিল না। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিলে দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা-প্রীতির কথা স্বতই আমার মনে উদয় হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটি ছিলেন বটে; কিন্তু, জীবনে তিনি কখনো সেলাম ঠুকিয়া উপরিওয়ালার 'খয়েরখাঁ'-গিরি করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের ভার-প্রাপ্ত সর্ব্ববিধ কার্য্য অনুগত দাসের ন্যায় তিনি সবিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু, ঐ পর্য্যন্তই শেষ। ইংরাজজাতির বিবিধ গুণ-মুগ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল অকপটেই ইংরাজের অনেক গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু, পদ-সম্মান লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে একদিনো কেহ লালায়িত হইতে দেখে নাই। কত ঘটিরাম তৈল-মৰ্দ্দন-দক্ষতায় রায়বাহাদুরি হইতে আরম্ভ করিয়া, নানাবিধ স্পৃহণীয় পদবীতে আরূঢ় হইয়া, যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; কিন্তু, তুচ্ছ পদ-মর্য্যাদার জন্য আত্মসম্মান বিনষ্ট করিতে দ্বিজেন্দ্র-লাল কখনো প্রস্তুত ছিলেন না,—বরং তদ্রূপ নীচ-বৃত্তিকে

নিতান্তই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। একদিন উক্তবিধ কোন খেতাবী ডেপুটী দ্বিজেন্দ্রলালের কলিকাতার ভবনে শুভাগমন করিয়া নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"বলি Mr. দ্বিজু, তুমি কেমন লোক হে? আমার এই সম্মানলাভে বিশ্বশুদ্ধ লোক আজ আমায় Congratulate কর্‌লে, আর তুমি কি না আপনার লোক হয়ে' আমার একটা খোঁজো নিলে না!" দ্বিজেন্দ্রলাল তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"তোমাকে যে সরকার বাহাদুর ব্যঙ্গ করেছেন, সেটা বুঝি বুঝ্‌লে না?" শুনা যায় —অতঃপর উক্ত ডেপুটী আর কখনো দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু সরল, নির্ভীক্, স্পষ্টবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল কাহারো নিন্দা-প্রশংসা জীবনে কখনো গ্রাহ্য করেন নাই;—যাহা যখন তিনি সত্য মনে করিয়াছেন, কাহারো মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া, তাহাই সঙ্গত বলিয়া তিনি অকপটে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন-চিত্ত দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবজ এই সকল ব্যবহার সময়ে সময়ে তাঁহাকে অনেকের নিকটে অত্যন্ত অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল; এমন কি, আমি জানি—এ ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল; কিন্তু, একদিন তাঁহাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিতে গিয়া যে উত্তর শুনিয়াছিলাম তাহা শোনা অবধি আমি আর তাঁহাকে এ সকল ব্যাপারে কোন কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। দ্বিজেন্দ্র-

লাল আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন—"কি বল তুমি? জীবনে তো কাহারো মুখ চেয়ে চলিনি; আজ এই বৃদ্ধ বয়সে কিসের জন্য, কার জন্য—কি লাভের আশায়, বিবেক ও বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে, লোকের মন-রাখা কথা বল্‌তে যাব? অমন নীচ বলে' আমাকে ভাববার তোমার কি কারণ আছে?"

গভর্মেণ্টের চাকুরী করিয়া, শশকের প্রাণ লইয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার মনীষা, তাঁহার প্রভাব ও শক্তি, তাঁহার অপরিসীম সাহস ও স্বাবলম্বনপ্রিয়তা সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচিত এমন কোনো লোক নাই, যিনি আজ নতশিরে স্বীকার করিতে বাধ্য না হইবেন। আমি তাঁহার স্বাধীনতা-প্রীতির এতই ঘটনা জানি যে, এ স্থলে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলে শেষ করিয়া ওঠা অসম্ভব হইবে।

সাহিত্য সেবা

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-শক্তি অতি বাল্যকাল হইতেই স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়স তখনি তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। শৈশবে তাঁহার সঙ্গীত-প্রীতি ও কবিত্ব-রস-গ্রাহিতা তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবেই স্ব-জনগণমধ্যে একটু বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। বাল্যকালে তাঁহার জনৈক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কবিতা রচনা করিতে বলিলে, অপরিণতমতি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বল্প-কাল নীরব রহিয়া, তারকাপুঞ্জের উদ্দেশে একটি ছোট কবিতা

মুখে মুখেই রচনা করিয়া আবৃত্তি করিয়াছিলে। দ্বিজেন্দ্রলালের বয়ঃক্রম যখন তের কি চৌদ্দ তখনকার রচিত কতকগুলি সঙ্গীত তিনি "আর্য্যগাথা" নামক পুস্তকে যোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াই মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। "আর্য্যগাথা" গীতি-কাব্য হিসাবে তৎকালে বঙ্গসাহিত্যে যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, অদ্যাপি বঙ্গীয় কোনো কবির বাল্য-রচনা তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। "আর্য্যগাথা" প্রকাশের পর কিছুকাল কবিবর অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং বিংশ বর্ষ বয়সে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে গমন করেন ও তথায় প্রায় তিন বৎসর কাল যাপন করেন। বিলাতে অবস্থিতিকালেও তাঁহার সাহিত্য-সেবার বিরাম ছিল না। তিনি সেখানে "Lyrics of Ind" নাম দিয়া কতকগুলি ইংরাজি কবিতা প্রকাশিত করেন। এই কবিতাপুস্তকখানি পাঠ করিলে কবির ভাব-ব্যঞ্জনা ও কল্পনা-স্ফূরণে অসামান্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও এ কাব্য তাঁহার বাল্য-রচনা "আর্য্যগাথা"র ন্যায় আন্তরিকতাপূর্ণ নহে তথাপি বিদেশী ভাষায় বিরচিত তাঁহার এই কাব্যখানি সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তৎকালে স্বদেশী ও বিদেশী সময়িক পত্রসমূহ এবং Sir Edwin Arnold প্রমুখ বিখ্যাত সমালোচকগণ এ পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা

করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিলে তাঁহাকে গোড়া হিন্দুসমাজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দান করেন। কিন্তু, বিলাত-প্রবাস তিনি কোনরূপেই দূষণীয় বিবেচনা না করায় সমাজের এব্যবস্থা তিনি মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না; ফলে, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, এমন কি আত্মীয়-স্বজনগণ পর্য্যন্ত যখন তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন তখন তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তরের অনিবার্য্য ক্ষোভে ও অপমানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, "একঘরে" নামক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের প্রতি অতি প্রখর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি সাহিত্য হিসাবে স্থায়িত্বলাভের আদৌ যোগ্য না হইলেও, ইহার ভাষা ও ব্যঙ্গ-ভঙ্গী সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ইহার পর কবিবরের "কল্কি অবতার" প্রকাশিত হয়। "কল্কি অবতারে" কবিবরের রচনার অনায়াস গতি ও সরস কৌতুক প্রকৃতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। "কল্কি অবতারে"র সঙ্গে সঙ্গে কবি "আষাঢ়ে" নামক একটি হাস্য-রস-প্রধান কবিতাগুচ্ছ মুদ্রিত করেন। এই কাব্যখানি দ্বিজেন্দ্রলালকে বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য দান করিতে পারিয়াছিল। এরূপ অনাবিল, হাস্য-চটুল ব্যঙ্গ বঙ্গভাষায় বিরল। নির্দ্দোষ, সরল রসিকতার প্রাচুর্য্য দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে ছিল না বলিলেও বোধ করি—

অত্যুক্তি হইবে না। অনেক হাস্যরসিক লেখকের রচনায় হাস্যের সঙ্গে অশ্লীলতার অজস্র ও প্রচুর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়; অনেক রচনা হাস্যের পরিবর্ত্তে বীভৎস রসেরি সঞ্চার করিয়া থাকে; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা শুচি-স্নাত, অম্লান হাস্যরসের স্বচ্ছ-শুভ্র রজত নির্ঝর! "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা", "অদল বদল", "ডেপুটীকাহিনী," "নসীরাম পালের বক্তৃতা' প্রভৃতি রচনাগুলি এ কথার প্রমাণ।

বহুদিন পূর্ব্বে "ভারতী" পত্রিকায় "আষাঢ়ে" কাব্যখানির এক সুদীর্ঘ সমালোচনাপ্রসঙ্গে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে সম্পূর্ণ সত্যেই পরিণত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "হাসির গান" আজ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমভাবেই সমাদৃত হইতেছে; সুতরাং, তৎসম্পর্কে এ স্থলে আমার পক্ষে কিছু বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার 'হাসির গান' বা যাবতীয় হাস্য-রচনারি বিশেষত্ব আছে। বঙ্গসাহিত্যে হাস্য-রসোদ্রেকে দ্বিজেন্দ্রলাল তুলনা-রহিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়। তাঁহার হাসির গান শুধু যে হাসায় তাহা নহে,—উহাতে শিক্ষণীয় ও চিন্তনীয় অসংখ্য বিষয় আছে। বিস্তারিত আলোচনার এ স্থানে নহে,—আমি শুদ্ধ ইঙ্গিতে দু'একঠা কথা বলিয়া যাইতেছি।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল "পাষাণী" নামক নাট্যকাব্য ও "বিরহ," "প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসন প্রচার করেন। তাঁহার প্রহসনগুলি বাঙ্গালা ভাষার পরম আদরের সামগ্রী। একমাত্র রসরাজ অমৃতলালের "বিরহ-বিভ্রাট" ব্যতীত, দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্তে"র ন্যায় অশ্লীলতা বর্জ্জিত, সভাজন-পাঠ্য প্রহসন বঙ্গভাষায় আর বড় আছে বলিয়া আমি মনে করি না। ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল "মন্দ্র" নামক একখানি খণ্ডকাব্য প্রকাশিত করেন। এই কাব্যখানি হাস্য, ও করুণ রসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ-গুণে ও গাম্ভীর্য্যে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ সাহিত্যরথিগণের অজস্র প্রশংসা সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিল। "বঙ্গদর্শনে"র নব-পর্য্যায়ে "মন্দ্র" কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতা ও অলৌকিক প্রতিভার যেরূপ অকপট ও অসঙ্কোচ খ্যাতিবাদ করিয়াছেন তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় নিপুণ ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক। তাঁহার নিকট হইতে এতদূর উচ্চ প্রশংসা বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোনো কবি অদ্যাপি লাভ করিতে পারেন নাই, এ কথা দ্বিধাহীন হইয়াই বলিতে পারা যায়।

"মন্দ্রে"র পর "তারাবাই" নামক একখানি নাট্যকাব্য প্রকাশিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য রচনার প্রতিভা সর্ব্বপ্রথম বিকশিত হইয়া পড়ে। এই নাট্য কাব্যখানি অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত হইলেও, ভাষার হিসাবে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরের

অনুরূপ সুমিষ্ট নহে। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, অভিনব অমিত্রাক্ষর-রীতি প্রচলিত করিতে গিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকটি আদৌ সুশ্রাব্য বা সুমিষ্ট করিতে পারেন নাই। ক্রিয়া-পদের প্রসারণে কবিতা শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। "তারাবাই" কাব্যে অমিত্রাক্ষরের আমি ইহাই সর্ব্বপ্রধান ত্রুটি বলিয়া মনে করি। একটু নমুনা দেখিলেই কথাটা বুঝা যাইবে।—"হইয়াছিলাম আমি তাঁহার আশ্রমে অতিথি দ্বাদশ দিন"।—বিলম্বিত ক্রিয়াপদটি পূর্ব্বে না বসাইলে ইহা গদ্য কি পদ্য তাহার নির্ণয়, নিতান্তই দুষ্কর হইত। সে যাহা হোক, "তারাবাই"এর ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র'কাব্য অপেক্ষাও শ্রুতিকটু হইলেও,ঘটনা-বিন্যাসে ও আখ্যান-বস্তুর বৈচিত্র্য হিসাবে রঙ্গমঞ্চে 'তারাবাই' নাটকি দ্বিজেন্দ্রলালকে দক্ষ নাট্যকার-রূপে পরিচিত করাইয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্ত বা বহুৎ আচ্ছা" ষ্টারে ও ক্লাসিক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহাই নিশ্চয় যে, নাট্যকার হিসাবে "তারাবাই" নাটকি দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যসমাজে নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা দান করে। অতঃপর, দ্বিজেন্দ্রলাল এই অকৃতী সাহিত্য-সেবকের অনুরোধক্রমে কবিতা ছাড়িয়া, গদ্যে নাটকরচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। যথাক্রমে তিনি এই সময় হইতে ছয় কি সাত বৎসরের মধ্যে "প্রতাপ সিংহ" "দুর্গাদাস," নূরজাহান, "মেবারপতন," সাজাহান," "চন্দ্রগুপ্ত" ও "পরপারে"—

এই সাতখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। এই সকল নাটকে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ উদ্দেশ্যে যে সকল অমূল্য আদর্শ ও প্রশস্ত পন্থার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান করা, আমার পক্ষে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেক নাটক পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিশ্লেষণ করিয়া না দেখাইলে দ্বিজেন্দ্রলালের যোগ্য সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা একান্তই অসম্ভব হইবে। এক একটি তুলির আঁচড়ে তিনি যে কি অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কণ করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ অভিনিবেশের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-সাগরে অবগাহন না করিলে তাহা কেহই বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার নাটকের ভাষা বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন, এবং অভাবনীয়রূপেই ঐশ্বর্য্যশালী। তাঁহার উপমা অনেকটা Shelley'র ন্যায় সংহত, শোভন, যথাযথ ও একাধারে বহুদিক্‌দর্শী। এক একটি চরিত্রে তাঁহার বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টির প্রাখর্য্য লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়! বস্তুত, অনেক স্থলে এই বিশ্লেষণ-শক্তি অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ। এই সঙ্গে যথাসম্ভব সংক্ষেপে, এই প্রবন্ধের শেষাংশে, আমি তাঁহার সাহিত্য-সেবারো কথঞ্চিৎ নগণ্য পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সকালে, বিকালে, রাত্রিকালে—সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে অনেক লোক আসিত; কিন্তু, তাঁহাকে অবসর সময়ের একটুও

অপব্যবহার করিতে দেখি নাই। মনে আছে—গয়ার মনস্বী লোকেন পালিত মহাশয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক আলাপ করিতে করিতে তিনি একবারেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে—দ্বিজেন্দ্রলালের সে জ্ঞান নাই! —বিচার বিতর্ক-পাঠ ও আবৃত্তি তুমুলবেগে চলিতেছে। এক রাত্রি মনে পড়ে—প্রায় যখন বারটা বাজে, আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের অভাবে একাই আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়া, নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম, জানি না; সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখি,—ঘড়িতে তখন ২॥০'টা বাজিয়া গিয়াছে,—দ্বিজেন্দ্রলাল তখনো সমভাবেই উচ্চকণ্ঠে Byron হইতে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন! এই ভাবে সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সৎকর্ম্মেই দ্বিজেন্দ্রলাল এ সংসারে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে এ দেশের আজ যে অনপনেয় ক্ষতি হইল, সে অভাব আর কবে পূর্ণ হইবে, কে জানে!

*   *   *   *

এখন যথাসম্ভব সংক্ষেপে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যেরো একটু সামান্য আলোচনা এই সঙ্গে মুদ্রিত করা হইল।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য

বলিতে লজ্জায় শির নত হইয়া পড়িতে চায় যে, আজো এদেশে এই সব তথা-কথিত শিক্ষিত মহোদয়গণের ভিতরে খুব অল্প লোকি দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র শ্রেষ্ঠ রচনার সহিত পরিচিত। যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত নহেন তাঁহাদের পক্ষে জাতীয় উন্নতি সাধন কল্পনামাত্র। আজ আর বঙ্গভাষা 'দীনা,' 'মলিনা,' 'ভিখারিণী' নহেন; আজ বঙ্গভাষা হাস্যোজ্জ্বল গীতিমুখরা, মহীয়সী সম্রাজ্ঞী। আজ বঙ্গভাষার সেবা করিয়া চরিতার্থ হইবার দিন আসিয়াছে; কিন্তু, দুঃখের বিষয়—এখনো বঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশীয় গ্রন্থকারের সহিত আশানুরূপ পরিচিত হইতে পারিতেছেন না। এখনো অনেকেই বঙ্গভাষার উত্তম পুস্তক উপেক্ষা করিয়া, বিলাতী অসার ও কুরুচিপূর্ণ নবেলগুলিকে পর্য্যন্ত সমাদর করিয়া থাকেন! বলিতে কি—এখনো শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের ভিতরে কেহ কেহ এমনো আছেন যিনি বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ না করায় একটা গর্ব্বই অনুভব করেন!

ভূমিকা

আমাদের বিশ্বাস—দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সম্যক উপলব্ধি করিতে আরো একটু বেশি দিনের প্রয়োজন হইবে। আজো বঙ্গদেশ তাঁহাকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই।

যে সকল লেখক কোনো একটা নূতন রকমের (Style) ঢং বা

ধরণের প্রবর্ত্তক তাঁহাদের সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে কিছু বেশি দিন বিলম্ব লাগে। যাঁহারা পাঠকের রুচি অনুসারে খাদ্য যোগান, অথবা কোনো সাময়িক ভাবের উপর নির্ভর করিয়া লেখনী চালনা করেন তাঁহারা অতি অল্পদিনেই প্রশংসিত ও পরিচিত হন। জগদ্বিখ্যাত কবি Shakespear'এর অনন্যসাধারণ প্রতিভাও তদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রথমত সমাদৃত হয় নাই। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালেরো সেই অবস্থা। যাহারা তাঁহার নিন্দুক তাহারা সত্যই হতভাগ্য! আবার, যাহারা তাঁহার চাটুকার তাহারাও কবিবরের প্রতিভা ও ক্ষমতা বুঝিতে পারে নাই, কেবল বিশেষ কোন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনার্থই তাঁহাকে স্তব করিয়াছে। এ বিষয়টি, বলা বাহুল্য—সেই চাটুকারগণের প্রশংসার মধ্য দিয়াই বেশ ধরা যায়। অতিশয়োক্তি ইহাদের একটি বিশেষ কু-অভ্যাস। আমরা দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রতিভা সম্যক্ বুঝিতে পারি, এরূপ গর্ব্ব করিতেছি না; কিন্তু, কেবল এইটুকুই আত্ম-প্রসাদ আছে যে, বুঝিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, এবং চেষ্টা করিয়া যাহা না বুঝি তাহা লইয়া মূর্খের মত অনর্থক বাগাড়ম্বর করি না।

কবি, পরিহাস-রসিক, নাট্যকার ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল এ দেশের যতগুলি উপকার করিয়াছেন তন্মধ্যে একটা প্রধান এই যে, ভবিষ্যবংশধরগণ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া এ দেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও নীতির একখানি

মোটামুটি চিত্র স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। কেবল সন, তারিখ, এবং জন্মমৃত্যুর ধারাবাহিক বিশুদ্ধ তালিকাই যদি প্রকৃত ইতিহাস না হয় তাহা হইলে কবিবর বর্ত্তমান ভারতের একজন সুনিপুণ ইতিহাসলেখক। তিনি কতকটা রাম না জন্মিতে (বাল্মিকীর ন্যায়) রামায়ণ রচনা করিতে পারেন। বঙ্গ-গৌরব, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু, সম্ভবত তিনিও কোনো নূতন "ধরণের" প্রবর্ত্তক নহেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নূতনের মধ্যে পুরাতনের এবং পুরাতনের মধ্যে নূতনের আভাস পাওয়া যায়। এগুণটি আমাদের আর কোনো নাট্যকারের নাই, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বসাধারণ্যে কেবল "হাসির কবি" বলিয়াই বেশি পরিচিত। অবশ্য একথা সত্য যে, তিনি একমাত্র হাসির কবিতার দ্বারাই বঙ্গ-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; কিন্তু, হাসির কবিতা ছাড়া কি নাটকে, কি প্রহসনে, কি গানে কি অন্যান্য কবিতায়—সর্ব্বস্থলেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় যথেষ্টই আছে। একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়া কিছুতেই সম্ভব-পর নহে; তবে, ভগবৎ কৃপায় ভবিষ্যতে সুযোগ উপস্থিত হইলে, একদিন ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিতে সাহসী হইব যে, দ্বিজেন্দ্র-

লালের তুল্য আর কোনো ব্যক্তি—বিশেষভাবে নাট্য-সাহিত্যে, ব্যঙ্গ-কবিতায়, এবং জাতীয় ভাবের অনুপ্রাণনায়—আপাতত আর বঙ্গদেশে ছিলেন না। তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এমন কিছু দান করিয়াছেন যাহা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই দিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা মৌলিকতায় উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ রুচিপরায়ণতায় মনোজ্ঞ, এবং সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে কবি, ব্যঙ্গ-কবি বা পরিহাসরসিক, দার্শনিক, সমালোচক, প্রবন্ধ-লেখক, ঐতিহাসিক এবং নাট্যকার।

এখন গোড়াতেই একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, যদি কেহ কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপেই ভ্রম-প্রমাদ শূন্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য ও সাহিত্য এবং আমার এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। কোন ব্যক্তিকে প্রশংসা করিতে হইলে তাহার ক্ষুদ্র-তুচ্ছ দোষগুলি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইলে চলিবে না। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, দ্বিজেন্দ্রও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনার এমন সঙ্কীর্ণ নিয়ম হইতেই পারেনা যে, দোষগুলিকেও গুণ বলিয়া প্রচার করিতে হইবে! এরূপ পক্ষপাতিতা ও অসার ভাবপ্রবণতার ফলে ক্রমে জগতে খাঁটিকথা এবং খাঁটি মানুষ মেলা ভার হইবে। দোষ সম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকাই যে কেবল ভক্তিমানের লক্ষণ নহে, তাহা নহে;

তাহা এক হিসাবে তোষামোদো বটে। শ্রদ্ধা বা ভক্তি যখন অসংযত ভাবে উচ্ছলিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যকে প্রশ্রয় দেয় তখনি তাহার নাম হয়—অসার ভাব-প্রবণতা। সাহিত্য-জগতে সমালোচনার স্বেচ্ছাচারিতা ও ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। সত্যকথা বলিতেই হইবে। সমালোচনার অর্থ—নিরপেক্ষ বিচার, উহা নিন্দা বা প্রশংসা নহে। তাই বলিতেছিলাম—দোষ সম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকা ভক্তিমানের লক্ষণ তো নহেই,—উহা তোষামোদি। তোষামোদ দুই প্রকার,—গুণটাকে তাহার প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা বাড়াইয়া বলা, আর দোষগুলিকেও গুণ বলিয়া প্রচার করা। এই শেষোক্ত তোষামোদি অতিরিক্ত মাত্রায় জঘন্য। আগেই দোষের দিক্ দেখাইয়া, প্রতিবাদের যোগ্য স্থানগুলি যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা উচিত; নতুবা, হঠাৎ শেষে দোষগুলি চক্ষুর সম্মুখে পড়িলে পাঠকের অবিচারিত অশ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে।

রসিকতা

সর্ব্বাগ্রে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতার কথাই বলিব। উক্ত কবিবরের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ হাস্যরসের কবিতা বঙ্গসাহিত্যে একপ্রকার অপরিচিত ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র ও রসরাজ অমৃতলাল প্রভৃতি কবিগণ হাস্যরসের কবিতা রচনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু, তাঁহাদের রচনার বহু স্থানে বাহুল্য-বর্ণনা বা অত্যুক্তি ও অশ্লীলতার যথেষ্ট সমাবেশ ঘটিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায়, প্রহসনে, গানে এবং Parody—অর্থাৎ, অনুকৃতি-কৌতুকে

হাসাইয়াছেন। তাঁহার অশ্লীলতার লেশস্পর্শশূন্য, অনায়াসোপহিত হাস্যরসোদ্ভাবন-প্রয়াস কোন স্থলেই সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই। তাঁহার হাসির কবিতার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত ভাষা ও ছন্দ।—এ সকল রচনার ছন্দ তাঁহার নিতান্তই নিজস্ব। এমন একটি কবিতা বা গানো নাই যাহার ছন্দ ভাবানুগ ও সম্যক স্বাভাবিক নহে। দ্বিতীয়ত, তাঁহার ভাষা ভাবপ্রকাশের একান্ত উপযোগী। বক্তব্য বুঝিয়া ছন্দোনির্ব্বাচনের শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। অনেক সময়ে ছন্দ, মিল, ও ধ্বনির বিচিত্র সমাবেশে খুব একটা সাধারণ কথাও সরস-রসিকতায় 'জমায়েৎ' হইয়া উঠিয়াছে। মিলের অনায়াস গতি ও অপূর্ব্বতাও বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার ছন্দ পূর্ব্ব প্রচলিত ছন্দ অপেক্ষা প্রায়ই একটু নূতন ধরণের,—অনেকস্থলে ইংরাজী কবিতা হইতেই গৃহীত, এবং সর্ব্বত্রই নিপুণ হস্তের কারু কার্য্য-মণ্ডিত।

তাঁহার হাসির কবিতার রুচি পরিমার্জ্জিত; কিন্তু, এই বিশুদ্ধ রুচি রক্ষা করিতে যাওয়ায় কোন স্থলে তাঁহার একটা 'আড়ষ্ট' ভাবের সাবধানতা পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বোধ হয় না—যেন তিনি কোন কথা ইচ্ছা করিয়া 'বাদসাদ' দিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া লইয়াছেন। বরং, দেখা যায়—তিনি এতই অনায়াসগামী যে, আর একটু এদিক ওদিক হইলেই যেন কোন কোন স্থলে তাঁহাকে অশ্লীলতা-পঙ্কে পড়িতে হইত, কিন্তু অপূর্ব্ব কৌশলে সামলাইয়া নিয়া-

ছেন। প্রত্যেক কবিতাই রসিকতায় ভরপূর। প্রতি রচনাটি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, এমন একটি ছত্র খুব অল্পই আছে—যাহা আড়ষ্টভাবের পরিচায়ক। অনেকেই হাসির কবিতা লেখেন; কিন্তু, তাঁহাদের রচনায় হাস্যরসোদ্ভাবনের ব্যর্থ প্রয়াসেই হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া থাকে। অনেক স্থলে এই পণ্ডশ্রম, এই 'সাহিত্যিক ব্যায়াম' দেখিয়া হাস্যের পরিবর্ত্তে করুণারি উদ্রেক হয়। এরূপভাবে হাসাইবার চেষ্টা 'সুড়সুড়ি' বা 'কাতুকুতু' দিয়া হাসাইবার মত।

দীনবন্ধুবাবু, অমৃতবাবু, কাব্যবিশারদ যথেষ্টই রসিকতা করিয়া আমাদিগকে হাসাইয়াছেন বটে; কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাঁহাদের সে সব ধরণ দ্বিজেন্দ্রলালের মত নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের এ হাসি অনেক স্থলে অশ্রুরি রূপান্তর; তাঁহার প্রতি হাসির গানি চিন্তা ও শিক্ষার প্রচুর খোরাক যোগাইয়া থাকে; অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, তজ্জন্য অনাবিল উচ্ছ্বসিত হাস্যের কোন ব্যাঘাত জন্মে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গোঁড়ামি ছিল না। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। যেখানেই আবর্জ্জনা, যেখানেই গলদ্, যেখানে আগাছা দেখিতেন সেখানেই তাঁহার ব্যঙ্গের কশাঘাত সমভাবে চলিত। সর্ব্বপ্রকার 'ন্যাকামি' ও ভণ্ডামির উপর তিনি খড়্গাহস্ত ছিলেন। তাই, দেখিতে পাই—কখনো হংসপুচ্ছ-পরিহিত কাকের মত বিলাত-ফেরৎ সম্প্রদায় তাঁহার বিদ্রূপের পাত্র, কোথাও দেখি—

ফোঁটা-তিলক-টিকিধারী, অনাচারী বিপ্রের উপর তাঁহার আক্রমণ ; কোথাও দেখি—ভণ্ড দেশ-হিতৈষীর ধাপ্পাবাজী প্রকাশ করিয়া দিতেছেন ; কোথায় দেখি—অর্ব্বাচীন সমাজ-সংস্কারক তাঁহার কশাঘাতে বিপর্য্যস্ত, এবং কোথাও দেখি—উচ্ছৃঙ্খল 'বাবু'-সম্প্রদায় তাহার সম্মার্জ্জনী-প্রহারে সন্ত্রস্ত। অথচ, তাঁহার এই সকল সুন্দর, সরস-কঠোর ব্যঙ্গের অভ্যন্তরে এমনি স্বভাব-সরল রসিকতা আছে যে, আক্রান্ত ব্যক্তিও সাময়িকভাবে তাহা মধুরভাবেই উপভোগ করিতে বাধ্য হয়।

অবশ্য তাঁহার সকল আক্রমণ, সকল ব্যঙ্গই যে ন্যায্য এবং যুক্তিযুক্ত তাহা বলিতে পারিনা। তবে, যাহা অযৌক্তিক তাহা অপরের কাছে অযৌক্তিক হইতে পারে ; কিন্তু, তিনি নিজে অযৌক্তিক ও অশোভন বুঝিয়াও, কেবল ব্যঙ্গের প্রলোভনে অথবা কোন অসাধু উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু লিখেন নাই। তিনি নিজে যাহা ঠিক বুঝিতেন তাহাই সরল ভাবে লিখিয়া যাইতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এই কারণে অনেক সময়ে তিনি দাম্ভিক বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন ; কিন্তু, সরলতারো একটা তো মূল্য আছে! তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতার কেবল ব্যঙ্গ মাত্রই উদ্দেশ্য নহে। যে হাস্য কবিতার উদ্দেশ্য কেবল হাস্যরসোদ্রেক মাত্র তাহা তেমন উচ্চস্তরের নহে। দ্বিজেন্দ্র লালের ব্যঙ্গ-কবিতার প্রভাব সমাজকে যে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর

করাইয়া দেয় নাই ইহা বলিতে যাওয়া, বোধ হয়—একান্তই অশোভন এবং অসঙ্গত হইবে। স্মরণীয়, স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়—ভাল হোক, মন্দ হোক,—ব্যঙ্গ করিতে পারিলেই ছাড়িতেননা; দ্বিজেন্দ্রলাল সেরূপ করেন নাই। তিনি ব্যঙ্গের বিষয় বা পাত্রকে যেমন ব্যঙ্গ' করিতেন, আবার ভক্তির পাত্রকেও তেমনি অকুণ্ঠ আগ্রহে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে পারিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'হাসির গান', 'আষাঢ়ে', 'কল্কী অবতার'—এই তিন থানি হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন।

স্বদেশিকতা

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-হিতৈষণা সম্বন্ধে বর্ত্তমান বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিবর্গকে আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতগুলি বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের মহার্হ রত্ন। ভাবের সম্পূর্ণ মৌলিকতার হিসাবে এ গুলির খুব শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলেও, পুরাতনের ভিতরে একটু যে নূতনত্ব আছে এবং প্রকাশের ধরণে,—সরল, সতেজ ও সুস্পষ্ট ভাব-বিন্যাসে এ সকল সঙ্গীতের যে একটা অপূর্ব্ব বৈচিত্র আছে তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশ-হিতৈষণা সম্বন্ধে অসার ভাব-প্রবণতার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার "নেতা" কবিতাটিতে ইহার বিশেষ পরিচয় আছে। তিনি জানিতেন যে, জন্মভূমির জন্য কেবল অলস অশ্রুপাত করা খুবই সহজ; কিন্তু, তাহার জন্য ত্যাগীর ন্যায় কার্য্য করা বস্তুতই কঠিন।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-ভক্তির ভিত্তি সার্ব্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায়। এ দেশ-ভক্তির পরম পরিণতি দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে—এই সমগ্র জগন্মঙ্গলেচ্ছায়! তাঁহার দেশভক্তি কোন জাতি বা দেশের উপর ঘৃণার উদ্রেক করে না। বলা বাহুল্য—এই বিশেষত্বটুকুই তাঁহার এবংবিধ রচনাগুলিকে অবিনশ্বর যশের অধিকারী করিয়া রাখিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল জানিতেন যে, ধর্ম্মোন্নতিতেই জাতীয় কল্যাণের পরাকাষ্ঠা। আমরা বর্ত্তমানে ধর্ম্মে খাটো হইয়া পড়িয়াছি। আচারের আবর্জ্জনা বাড়িয়া উঠিয়া, দেবতার সিংহাসনখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; তাই, তিনি অনেকস্থলে আচার-গত কুসংস্কারের উপর ভীষণ আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—ধর্ম্মই আমাদের মজ্জাগত। দ্বিজেন্দ্রলালের অচপল স্বদেশভক্তি কখনো অসংযতভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া অতি-বৃষ্টির মত নিজের কাজকে নিজেই নষ্ট করে নাই।

প্রেম

বঙ্গদেশে প্রেমের কবিতার অভাব নাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় সকল কবিই প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় কবিদিগের একটি অস্থি-মজ্জাগত দোষ এই যে, তাঁহারা কবিতা লিখিতে হইলেই প্রেম লইয়া বসেন। অবশ্য আমি একথা বলিতেছি না যে, প্রেমের কবিতা লেখা উচিত নহে; বরং, এক হিসাবে দেখিতে গেলে—প্রেমি

কবিতার প্রাণ। কিন্তু, আজকাল প্রায় কবিরাই যেন কেমন এক প্রকার 'একঘেঁয়ে' ও জরাজীর্ণ, সেই 'মামুলি' রকমের প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু এই 'মামুলি' ধরণের প্রেমের কবিতা খুব অল্পই লিখিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, প্রেম ছাড়া স্নেহ, ভক্তি, অনুকম্পা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কবিতা লিখিবার উপাদান অনেক আছে। 'আর্য্যগাথা'নামক কবিতা গ্রন্থে যে সকল প্রেমের কবিতা পাওয়া যায়—যদিও তাহাতে বিশেষ কোন মৌলিকতা নাই তথাপি—সেগুলির রুচি অতি বিশুদ্ধ ও ভাব যথার্থই আন্তরিকতাপূর্ণ। এই পুস্তক কবিবরের পঞ্চদশ কি ষোড়শ বৎসর বয়সে লিখিত। যে প্রতিভা একদিন সমগ্র দেশকে স্তম্ভিত করিবে, কিশোর বয়সেই—উন্মেষ সময়েই তাহার এই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল "আর্য্যগাথা," "মন্দ্র," "আলেখ্য," "ত্রিবেণী" নামক চারিখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কাব্যে তিনিও প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন ; কিন্তু, তাহা অতি পবিত্র, স্বর্গীয় এবং সর্ব্বত্রই সুরুচিসঙ্গত।

একমাত্র কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা ব্যতিরেকে আধুনিক বঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম কবিতার তুলনাই হয় না। তিনি "মেবার পতন" নাটকে মানসী, কল্যাণী ও সত্যবতীতে তিন রকম প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া একস্থানে তাহাদের চরম পরিণতি দেখাইয়াছেন। প্রথমে পতিপ্রেম বা

দাম্পত্য, সেই পতিপ্রেম পরে স্বদেশ-প্রেমে, অবশেষে এই স্বদেশ-প্রেমি বিশ্বপ্রেমে পরা-পরিণতি লাভ করিল। তিনি বিভিন্ন নাটকে বিভিন্নপ্রকারে প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম সম্বন্ধে ধারণা খুবি Practical! তিনি স্বাভাবিক প্রেমকে কেবলি একটা 'কি-যেন-কি' রহস্যময়, 'বুঝি বুঝি-বুঝিনা' ভাবে দেখিতেন না। প্রেমকেও তিনি যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া, 'তন্ন তন্ন' করিয়া দেখিয়াছেন।

প্রেমের কবিতা লিখিতে যাইয়া অনেক উচ্চস্তরের কবিরো পদস্খলন হইয়াছে; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যেক প্রেমের কবিতাই সুরুচিসঙ্গত। তাঁহার প্রেম রূপজ নহে,—অনেক স্থলেই গুণজ। সৌন্দর্য্য ও প্রেম সম্বন্ধে তিনি তাঁহার "আলেখ্য" কাব্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"সৌন্দর্য্য নয় দেহের বর্ণ,
ওষ্ঠ-অক্ষির আকার ভেদ,
গ্রীবা-গণ্ডের প্রকার মাত্র,
—সে তো শুদ্ধই অস্থিমেধ!
দণ্ডমাত্র আঁখির তৃপ্তি,
—সুখের সেবা, প্রেমের নয়;
যেথায় দীপ্ত প্রাণের দীপ্তি
সে সৌন্দর্য্যই ধন্য হয়"।

এই মার্জ্জিত রুচির পরিচয়ে তিনি বুঝি বঙ্গীয় যাবতীয় কবিকেই পরাস্ত করিয়াছেন। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল নারী জাতিকে কেবল মধুর ভাবে অথবা কামনার বস্তু বলিয়াই দেখেন নাই ;—তাঁহার নারী জাতিকে দেখিয়া মাতৃত্ব-স্বস্থত্বের কথাই বেশি মনে পড়িত, এবং নারীর ললিত দেহ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিগুলির কথাই আগে মনে জাগিত।

পৌরুষ।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়, চরিত্রে, ও আচরণে—সর্ব্বত্রই পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েলি ধরণটা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। তাই, তিনি লম্বা লম্বা, কোঁকড়ানো চুল রাখা, নাকিস্থরে কথা বলা, মন্থর পাদক্ষেপে গমন, অপাঙ্গ দৃষ্টি-নিক্ষেপ প্রভৃতির উপর চিরদিনি 'হাড়ে চটা' ছিলেন। পুরুষ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোকের মত হইবে, ইহা তাহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইত। তাঁহার "আনন্দ বিদায়" নামক (Parody) অনুকৃতি-কৌতুকে তিনি যেন কতকটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, অশোভনরূপে ও অন্যায়ভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নাটকেও বীরচরিত্র অঙ্কন করিতেই বেশি ভালবাসিতেন। কেবলি প্রেমের ছড়াছড়ি তাঁহার নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুরুষত্ব সম্বন্ধে তিনি পাশ্চাত্যজাতির অনুকারী। তাঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধবর্ণনার গানগুলি বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং অভাবনীয়রূপে অতুল। এস্থলে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও পরাজিত করিয়াছেন, ইহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে।

সেবা

এই পৌরুষের আধিক্যে আবার তাঁহার অনেকগুলি কবিতা—কবিতার প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিক কোমলতা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কবিতা বীররসের হইলেও তাহার মধ্যেও একটা স্বাভাবিক কোমলতা থাকিবেই ; কারণ, কোমলতাই কবিতার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন একটু বেশি 'মেয়েলি', দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা তেমনি আবার একটু বেশি পরুষ। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত একাধারে 'মেঘনাথবধে' গভীর নির্ঘোষে দুন্দুভি বাজাইয়াছেন, আবার 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে মধুর বংশীধ্বনিও করিয়াছেন। এই যে একি কবির রচনায় মধুর ও কঠোর দুইটি বিপরীত ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ, দ্বিজেন্দ্রলালের ভিতরে বুঝি তাহা তেমন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের করুণ রসের ভিতরেও যেন কিছু কিছু কাঠিন্যের বা পরুষের—আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে অবশ্য একটু নূতনত্ব আছে ; কিন্তু, নূতন হইলেই তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা সর্ব্বদাই ওজস্বিনী ও পৌরুষপ্রকাশিনী। তাঁহার ছন্দ, শব্দ, বিষয় নির্ব্বাচনো সর্ব্বথাই পৌরুষব্যঞ্জক।

দ্বিজেন্দ্রলাল কতকটা নিরাশাবাদী অর্থাৎ Pessimist. দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যভাবের দার্শনিক। তিনি তার্কিক ও যুক্তিবাদী।

আধ্যাত্মিকতা।

কিন্তু, তর্কের তো কোনো মীমাংসা নাই! তিনি জগতের প্রত্যেক বিষয়ি তর্কের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন ; সুতরাং, তর্কের অন্ত না পাইয়া, অনেক স্থলে সন্দেহবাদী হইয়া

পড়িয়াছেন ! এই জন্যই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ও আধ্যাত্মিকতার দিক্ দিয়া তাঁহার কবিতার স্থান তত উচ্চে নহে। তাঁহার কবিতা পাঠে বুঝিতে পারা যায়—তিনি Personal God অথবা Impersonal-personal God মানিতেন না। যখন জগতে নানা বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া জগতের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে তখনি মানুষ এই জগৎছাড়া, অপ্রত্যক্ষ, কোনো চৈতন্যময়, সর্ব্বশক্তিমান সত্তায় বিশ্বাস করিয়া, অন্তরে সান্ত্বনা ও শান্তি পায়। এই অপ-রোক্ষানুভূতির প্রভাবেই লোকে সম্পূর্ণ রূপে Pessimist হইয়া পড়ে না। কিন্তু, যাহাদের জগতের উপর বীতশ্রদ্ধা হয়, অথচ তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অতীন্দ্রিয় এমন কোনো সত্তার অনুভব করিতে পারেনা— যাহা সর্ব্বশক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ, অন্তর্য্যামী, এবং সর্ব্বভূতে দয়াবান, অনিবার্য্যরূপেই তখন নিরাশভাব বা Pessimism তাহাদের প্রাণে আসিয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালেরো সেই অবস্থা। তাঁহার কবিতায় দেখা যায়—তিনি স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, দেব-দেবী সম্বন্ধে বড় বেশি আস্থাবান ছিলেন না। তিনি ভাল-মন্দ যাহা-কিছু—প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়াই দেখিতেন। তিনি পুরুষকার ও নীতি মানিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কি কবিতায়, কি নাটকে, কি ব্যক্তিগত জীবনে যুক্তি-তর্কের দিকেই তাঁহার মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাঁহার "পরপারে" নাটকের সেই একমাত্র ভাবানীপ্রসাদ ছাড়া আর কোনো নাটকে তিনি ভক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান নাই।

শেষ জীবনে তিনি কতকটা মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু, এই আংশিক আধ্যাত্মিকতায় তিনি যে কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা পৌছিয়াছিলেম, এমন বলা যায় না। তিনি মানুষ; মানুষের পক্ষে এই জগতের একটা অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইবেই। বিখ্যাত হার্বার্ট স্পেন্সারো লিখিয়াছিলেন যে, "এই এত বড় বিরাট ব্যাপার—এই অসংখ্য সৌরজগৎ, ইহা কে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে? কে জানে ইহার পশ্চাতে কে আছে!" নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল সন্দেহবাদী কর্ম্মীর চিত্রই বেশী অঙ্কিত করিয়াছেন। শক্তসিংহ ও চাণক্যই এ কথার প্রধান দৃষ্টান্ত। চাণক্যের হৃদয়হীন, ভক্তিহীন পুরুষকার অবশেষে তাঁহার নিজের আত্মার কাছে নিজেই পরাজয় স্বীকার করিল। তবু, সে সময়েও তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেন না; অথচ, কি যেন একটা কোমল ও মধুময় আকর্ষণে তাঁহার জীবনের গতি সহসা ফিরিয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাতেও দেখা যায়—কি যেন একটা অপার্থিব, অনুভবনীয় সংবেদনা তাঁহাকে আঘাত করে, যাহার নিকটে তিনি লুটিয়া পড়িতেছেন; কিন্তু, সেটা যে কি তাহা তিনি নিশ্চিত-রূপে ধরিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরের উল্লেখ তাঁহার কবিতা ও নাটকের স্থানে স্থানে থাকিলেও, তন্মধ্যে ভক্তিবাদ নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ঈশ্বর যেন কতকটা অপরিচিত, অস্পষ্ট এবং সে অজ্ঞাত সত্তা কেবল মাত্র বিশ্বপ্রেমেই প্রস্ফুট।

তাঁহার এই ঈশ্বরের সহিত সম্পর্ক বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় কান্তভাবে বা হাফেজের ন্যায় প্রণয়িনী ভাবে নহে; তাঁহার ঈশ্বরের সহিত রাজা-প্রজা ও পিতাপুত্র সম্বন্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ধর্ম্ম ও স্বর্গ—'পরহিত-ব্রত'; মরণ তাঁহার কাছে মধুর নহে,—আবার ভীষণো নহে। মৃত্যু তাঁহার কাছে একটা নিয়ম মাত্র,—একটা রহস্য! দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সহিত এই অংশেই কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্পূর্ণ বিরোধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় (Humanity) বিশ্বপ্রেম কম, দ্বিজেন্দ্রলালে তাহা প্রচুর। আবার রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় কোমল ভক্তিবাদ বেশী, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় তাহা নাই। এইজন্যই, আমরা বলিতে বাধ্য যে, দ্বিজেন্দ্র-লালের কবিতা ভাব-সম্পদে সম্পূর্ণই মৌলিক, তাহাতে রবি বাবুর প্রভাব নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভাষা ও ছন্দের প্রচুর পার্থক্য; এস্থানে দেখিলাম যে, ভাবেরো অনৈক্য। তবে কিনা—অনেক স্থলে এরূপ হওয়া সম্ভব যে, অনেক উপমা, বা অনেক কথা উভয়ের কবিতায় একি রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, উপমা বা ভাব কাহারো একার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক ভিন্ন দেশবাসী কবিও এক ভাবেরি কবিতা লিখিয়াছেন। তবে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যেক লেখকের ন্যায় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালে কোন কোন

বিষয়ে অল্পাধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নিকটে ঋণী। Sheley'র প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে Byron'এর উপরে পড়িয়া তাঁহার কবিতায় নূতন শক্তি দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাবের দিক দিয়া বৈষ্ণব কবি ও উপনিষদের প্রভাব বেশী, আর দ্বিজেন্দ্র-লালের কবিতায় ইংরেজ কবির প্রভাব বেশী। আমি এস্থলে রবীন্দ্রনাথের কথাও উত্থাপন করিলাম; বোধ হয়—ইহাকে অবান্তর বলিয়া ভাবিবার কোনো কারণ নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল সমসাময়িক কবি। একের সমালোচনা করিবার সময়ে অপরের কথার উল্লেখ করা, অনেক কারণে অনিবার্য্যরূপেই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কথা আংশিক উত্থাপন করিতেই হইবে।

সত্যনিষ্ঠ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আদৌ আধ্যাত্মিকতার ভাণ ছিল না। এই ভক্তির অল্পতা তাঁহার সরলতারি পরিচায়ক। তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা কেবল প্রচলিত বিশ্বাসেরি অনুবর্ত্তন করেন,—নিজেদের কিছুমাত্র বিচার-ক্ষমতা নাই; তাঁহাদের ভিতরে আদৌ হয়ত ঈশ্বর-প্রেমি নাই; কিন্তু, ঈশ্বর-প্রেমের ভাণ করিয়া অনায়াসেই কল্পনা-বলে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। এই সব কবিদের কবিতা কাজেই প্রাণহীন, সরলতাশূন্য, আড়ষ্ট ও মামুলি হইয়া পড়ে। কারণ, কাব্য কবি-হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি বৈ তো আর কিছু নয়?

স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, অনুকম্পা, দয়া প্রভৃতিতে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়-তন্ত্রী স্বতই সর্ব্বদা বাজিয়া উঠিয়াছে। যেখানেই কোনো মহদ্ভাবের পরিচয় পাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার আত্মা সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্ধবিশ্বাসে সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কার প্রশ্রয় পায়; তাই মনে হয়—অন্ধ বিশ্বাস বা গোঁড়ামি অপেক্ষা সত্যকাম সন্দেহবাদো অনেক ভালো। একটা উচ্চতম আদর্শের অপূর্ব্ব কল্পনা দ্বিজেন্দ্রলালের মনে নিয়তই জাগরুক ছিল; কিন্তু, সেটা যে কি তাহা তিনি কখনো ঠিক নির্দ্দিষ্টরূপে ধরিতে পারেন নাই। ইহাকে যদি ঈশ্বরানুভূতি কেহ বলে তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু, যে ভাবে সাধারণ লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তিনি সেভাবে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার "সত্যযুগ" কবিতাটি পড়িলে দেখা যাইবে যে, একটা মহান আদর্শের অস্পষ্ট আভাস তিনি মনে মনে অনুভব করিতেন।

ভগবৎ কবিতাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু, ভগবৎ কবিতা না লিখিলেই একজনকে নিম্নস্তরের কবি বলিতে পারি না। কারণ, কবিতার কোনো নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই। দেখিতে হইবে যে, কবি যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাকেই তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিয়াছেন কিনা। তাহা পারিলেই সেকবিতা উচ্চাঙ্গের হইল। যদি কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কবিতা ভালো করিয়া না লিখিতে পারে

এবং অপর আর একজনে যদি বৃক্ষ সম্বন্ধেও একটি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে তাহা হইলে সেই বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কবিতাটিই প্রশংসনীয় হইবে। অর্থাৎ, কবিতার বিচার—বিশেষত্ব ও কবিত্ব লইয়া, বিষয় লইয়া নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাকেই সরল সহৃদয়তার সহিত স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কবিতা আদৌ দুর্ব্বোধ্য নহে। একটা সহজ ও সতেজ ভাবে তাঁহার সমস্ত রচনা অনুপ্রাণিত।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে একটু অস্পষ্ট ভাব—অর্দ্ধব্যক্ত, অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন ভাব আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় তাহা কম। অবশ্য Suggestiveness' ই কবিতার প্রাণ; কিন্তু, অনেক স্থলে এই 'কি-যেন-কি' ভাবটা আধুনিক বহু কবিতায় এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে অর্থবোধেরি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন, যাহা প্রকাশের ভিতরে প্রকাশের অতীত তাহাকেই প্রকাশ করিতে; এইজন্যই তাঁহার কবিতা একটু অস্পষ্ট। কারণ, সে অনুভূতিকে বাহিরে বুঝাইতে হয়—'না-বুঝা'র মধ্যে দিয়া, তাহাকে পাইতে হয়—'না-পাওয়া'র মধ্যে দিয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল সে ভাবের কবিতা লেখেন নাই। ছন্দ ও ভাষার বিশেষত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে, বোধ হয়—এই ভগবদ্ভক্তির অল্পতাহেতুই জাতীয় কবিতা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কবিতাগুলি এদেশবাসীর হৃদয় তেমন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ভগবদ্ভাব ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জাগত। খুব সাধারণ ভাবেও একটা ভগবৎ কথা লিখিলেই এদেশবাসীর হৃদয়ে তাহা বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় স্পন্দন তোলে। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায় যাহা দিয়াছেন তাহা এদেশবাসীর পক্ষে নূতন; কিন্তু, এ নূতনত্বে তাহারা এখনো মুগ্ধ হয় নাই; কারণ, ইহা তাহাদের অপরিচিত ও ধারণার অতীত।

দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তর্জ্জগতের কবি। তিনি দার্শনিক। তিনি বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতিতেই অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্যই, পরিশেষে তাঁহার কবিত্ব নাটকের ভিতরে পরিণতি লাভ করিল।

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ

তিনি আকাশ-বাতাস, আলোছায়া অপেক্ষা সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রীতি ভক্তি-অনুকম্পা লইয়াই বেশি কবিতা রচনা করিয়াছেন। অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনা করিতে যতটুকু বহিঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হইত ততটুকুই তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মুখ্য বর্ণনার বিষয় ছিল—অন্তঃপ্রকৃতি। তাঁহার রচনায় বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিবার উপায় মাত্র। তাঁহার নাটকেও তিনি অন্তঃপ্রকৃতির সহিত পরিপূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি রাখিয়া বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির ভিতরে সেই আনন্দময়ের খেলা দেখিয়া ভক্তি-পুলকিত হন নাই বা সেই অরূপকে রূপের মাঝে স্পর্শ করিয়া সার্থক হইয়া ওঠেন নাই;—তিনি প্রকৃতির কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা সম্যক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, একটা রহস্য-মুগ্ধ

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়া, তর্ক দিয়া, বিজ্ঞান দিয়া তন্নতন্ন করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, প্রকৃতিকে তো কেহ কখনো এমন প্রশ্ন করিয়া কিছু বুঝিতে পারে নাই, দ্বিজেন্দ্রলালো পারেন নাই ; সুতরাং, অবশেষে স্বতই তাঁহার সন্দেহবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা প্রায়শ যাহা প্রত্যক্ষ—তাহা লইয়া, তাহাকে পরিস্ফুট করিয়াই তৃপ্ত থাকিত। অতএব, দ্বিজেন্দ্রলাল Realistic.

তিনি "সোরাব রুস্তাম" ও "সীতা" নামক দুইখানি নাট্যকাব্য লিখিয়াছেন। "সীতা" মিত্রাক্ষর ও "সোরাব রুস্তাম" অমিত্রাক্ষর।

নাট্যকাব্য ও প্রহসন

"তারাবাই" ও "পাষাণী" নাটক তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দেই লিখিয়াছেন। তাঁহার অমৃতাক্ষর ছন্দ মাইকেলের মত গম্ভীর ও সতেজ নহে, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের মত ললিত-মধুরো নহে। তবু, তাহাতে যে ভাষা ও ছন্দের অনায়াসগতি এবং ভাবপ্রকাশের সহজ স্বাভাবিকতা নাই, এমত বলা অন্যায্য হইবে।

তিনি "সীতা" কাব্যে পৌরাণিক রাম চরিত্র, যুক্তিতর্কের দ্বারা যেরূপ বুঝিয়াছেন সেইভাবেই প্রকটিত করিয়াছেন। কোন স্থলে তিনি কেবল অন্ধভাবে প্রচলিত মতেরি অনুবর্ত্তন করেন নাই। তিনি কাব্যে ও জীবনে সর্ব্বথাই স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার "পাষাণী" নাটকেও দেখিতে পাই—অহল্যা-চরিত্র এই প্রচলিত

মতের প্রতিকূলেই চিত্রিত হইয়াছে। 'মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় তিনি তাঁহার এ সম্পর্কীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যেক পুস্তকেরি ভূমিকা লিখিতেন, এবং ভূমিকায় সর্ব্বথা অযোগ্য সমালোচকগণের উপর তীব্র আক্রমণ থাকিত। অনেকে মনে করেন—এই ভূমিকাগুলি একটু ঔদ্ধত্য প্রকাশক; কিন্তু, আজকাল সাহিত্য-জগতে ঔদ্ধত্য নাহৌক্, অন্ততঃ একটু কঠোরতার প্রয়োজন হইয়াছে; অনেক নগণ্য ব্যক্তি না বুঝিয়া, এমন কি পুস্তকগুলি আগাগোড়া না পড়িয়াই, সমালোচনার ছলে আক্রোশ করিয়া অনর্থক তাঁহাকে গালাগালি দিয়াছে।

'সোরাব রুস্তম' অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীর যোগ্য হয় নাই; কিন্তু, 'সীতা' নাট্যকাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যের একখণ্ড অমূল্য রত্ন স্বরূপ।

"তারাবাই" ও "পাষাণী"ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটকে তিনি আদৌ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গদ্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইতে থাকে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক ও প্রহসন

দ্বিজেন্দ্রলাল "একঘরে," "বিরহ," "বহুৎআচ্ছা," "পুনর্জ্জন্ম" প্রভৃতি কতকগুলি প্রহসন লিখিয়াছেন। ইহাতে বিবিধ প্রকার সমাজ-চিত্র এবং রসিকতা আছে। স্বর্গীয় দীনবন্ধু ও রসরাজ অমৃতলালের

দু'এক খানি প্রহসন ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রহসন বঙ্গসাহিত্যে আর কে লিখিয়াছেন, জানি না। এই সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণ সুরুচিপূর্ণ। সাহিত্যে কোনরূপ কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়ার উপর চিরকাল তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল।

নাট্য-সাহিত্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের মহার্ঘ সম্পৎ। যদি উক্ত কবির সর্ব্বপ্রধান অক্ষয় কীর্ত্তি কিছু থাকে তাহা তাঁহার এই নাটক সমূহ। বঙ্গের কোন রঙ্গালয় তাঁহার এই সকল নাটক অভিনয় করিবার মত উপযুক্ত অবস্থায় এখনো উপনীত হয় নাই। দু'একজন মাত্র অভিনেতা কেবল তাঁহার নাটকের জটিল চরিত্রগুলির অভিনয় করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন; নতুব', সাধারণত অন্যান্য অভিনেতৃগণ হাততালি পাইবার জন্য, ব্যবসার খাতিরে, নাট্যরসানভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের অমার্জ্জিত রুচির অনুযায়ী অভিনয় করিয়া, তদীয় নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য নষ্টই করিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা কেবল রঙ্গমঞ্চেই তাঁহার নাটকের সহিত পরিচিত তাঁহারা তাঁহার নাটকের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এই জন্যই, অপ্রিয় হইলেও এই সত্যটুকুর উল্লেখ, আবশ্যক বোধ করিলাম।

তিনি কোন সাময়িক ভাবকে লক্ষ্য করিয়া নাটক লেখেন নাই; অথচ, বর্ত্তমান কাল যাহা চায় তাহা তাঁহার নাটকে

আছে। কিন্তু, তা' সত্ত্বেও, তাঁহার কোন কোন নাটক সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেরি স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। কেবল কোন সাময়িক ভাবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা করিলে সে গ্রন্থ স্থায়ী সাহিত্যরূপে গণ্য হইতে পারে না; যতদিন সেই সাময়িক ভাবের প্রবাহটুকুর অস্তিত্ব থাকে শুধু ততদিনি ঐ গ্রন্থের সমাদর হইতে থাকে।

তিনি কোন তত্ত্বকথা প্রচারের জন্য নাটক লিখেন নাই; অথচ, অনেক তত্ত্ব সরলভাবে তাঁহার নাটকে আপনা আপনি পরিস্ফুট হইয়াছে। বস্তুত পক্ষে নাটক, নাটকমাত্র; তাহা সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ অথবা দর্শন-শাস্ত্র নহে। যদি শাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন, ইতিহাস নাটকে থাকে তাহা গৌণ ভাবে। নাটকের নাটকত্বই মুখ্য লক্ষ্য।

তিনি ব্যবসার খাতিরে অথবা অভিনয়ের জন্যই কেবল নাটক রচনা করেন নাই। এই ব্যবসার খাতিরে নাটক লিখিতে গিয়া শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরীশচন্দ্রেরো সময়ে সময়ে পতন হইয়াছিল; এই ব্যবসার খাতিরেই মাননীয় অমৃতলাল বসুরো পদস্খলন ঘটিয়াছে; এবং অধুনা ব্যবসার খতিরেই কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর নাট্যকার নাট্যজগতে নিতান্তই বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছেন। ইহাঁরা নাটকে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দৃশ্য, উড়ে যাত্রার মত অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক গান, বটতলার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত অসম্ভব

ঘটনার অনাবশ্যক সমাবেশ নিঃসঙ্কোচেই ঘটাইতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে কাহারো কাহারো নাটক অতি জঘন্য অশ্লীলতা দোষ-দুষ্ট, গ্রাম্যতাপূর্ণ এবং নিতান্তই 'সেকেলে' ধরণের।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ভাষার মাধুর্য্য, চরিত্র-বিশ্লেষণের নিপুণতা, দৃশ্যসমাবেশের কৌশল, ঘটনাপরম্পরার দ্রুততা, সরস বিবৃতি, সঙ্গীতে নূতন ধরণের রাগরাগিণীর সমাবেশ, পদ-লালিত্য, ঘটনাবলীর কেন্দ্রানুবর্ত্তিতা, রুচির বিশুদ্ধতা, বক্তব্য বা উক্তির নাতিদীর্ঘতা, উপাখ্যান ভাগের মৌলিকতা প্রভৃতি গুণে নাট্যজগতে শীর্ষস্থান লাভ করিবার যোগ্য।

তিনি নাটকে স্বগত উক্তি বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুইজন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতেছে, ইতিমধ্যে আর একজন উচ্চৈঃস্বরে গোপনীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে; সমস্ত শ্রোতৃবর্গই তাহা শুনিতেছেন, কেবল পার্শ্ববর্ত্তী অভিনেতাটি তাহা শুনিতে পাইতেছেন না,—ইহা একান্তই অস্বাভাবিক এবং হাস্যকর। দ্বিজেন্দ্রলাল অতি চমৎকার কৌশলে এই স্বগত উক্তি বাদ দিয়া, নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পরের কথা ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া, অতি সংক্ষেপে এবং বিশেষ নিপুণতার সহিত তাহাদের মনোভাব প্রকটিত করিয়াছেন।

এই স্বগত-উক্তি বর্জ্জন-প্রয়াস সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন।

তাঁহার নাটক অনেক অভিনেতাকে 'অর্থপূর্ণ দৃষ্টি' নিক্ষেপ করিতে এবং 'অর্দ্ধ-স্বগত" কথা কহিতে শিখাইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকেও অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বর্ণনা গুলি সমধিক প্রাসঙ্গিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে ব্যক্তিবিশেষের চিত্তে অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন ভাবে অনুভূত হয়, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বলা বাহুল্য—তাহাতে যথার্থই প্রকৃতি-দর্শন-জ্ঞান জন্মে।

তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করিয়া যান নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে। নাটক ইতিহাস নহে; কিন্তু, আবার ঐতিহাসিক নাটক যে একেবারেই ইতিহাস ছাড়া নহে,—তিনি তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

তিনি মানব-চরিত্রের সকল দিক্, সকল বৃত্তির ক্রিয়া দেখাইতে পটু ছিলেন। কোন কোন স্থানে খুব সাধু চরিত্রের মধ্যেও দুই একটি দুর্ব্বলতা দেখাইয়া, এবং অসাধু চরিত্রের ভিতরেও দুই একটি মহত্ত্বের দিক দেখাইয়া, চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকত্বে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছেন।

অনেক গুণরাশির ভিতরে কোথায় কোন্ পাপটুকু লুক্কায়িত রহিয়াছে, পরবর্ত্তী ঘটনা পরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাই অবশেষে কিরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়া, সর্ব্ববিধ অবস্থার বিপর্যায় ঘটাইয়া দেয়,—তিনি তাহা অসাধারণ দক্ষতার সহিতি দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, অনেক দোষের মধ্যে কোথায় একটু মহত্ত্বের বীজ গোপনে নিহিত আছে, অনুকূল আবেষ্টনের ফলে তাহা কিরূপে বাড়িয়া উঠিয়া মানুষকে দেবত্বে লইয়া যায় তাহাও তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। মানব-চরিত্রের যে সমস্ত গুণ বা দোষ সহজে অন্যের চক্ষে ধরা পড়ে না, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহারি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্পষ্টরূপে দেখাইতে পারিয়াছেন। এরূপ চরিত্রাঙ্কনে মনুষ্যসমাজের উপকার হয়। অনেক সময়ে মানুষ হৃদয়ের মধ্যে কোথায় একটু পাপ আছে, প্রথমতঃ অনবধান বশতঃ তৎসম্বন্ধে সাবধান হইতে অথবা তদুচ্ছেদ-সাধন কল্পে আদৌ কোন সতর্কতা অবলম্বন করে না ; কিন্তু, অবশেষে দেখিতে পাই—ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে সেই ক্ষুদ্র অসৎ প্রবৃত্তির বীজটি কালে মহা বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া তাহার শাখা-পল্লবে হৃদয়-দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ চরিত্রালোচনা করিলে মানবের মানসানুসন্ধানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। অনেক সময়ে তাঁহার নাটক পড়িতে পড়িতে এমনো মনে হইয়াছে যে, হয়ত বা দ্বিজেন্দ্র-

শাল অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাইতে সেক্সপিয়রের ন্যায় শক্তিশালী! মানুষের ভিতরে যে দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহা তিনি স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিতে পারিতেন। এই প্রকার জটিল চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে। অন্তর্বিরোধের বহির্বিক্ষেপ অপেক্ষা, পুটপাক যন্ত্রমধ্যস্থ আচ্ছাদিত প্রদাহের মত, অন্তর্নিগূঢ়, তীব্র আক্ষেপ প্রদর্শনেই সমধিক কৃতিত্ব। এইজন্য বঙ্গীয় নাট্য-জগতে "নুরজাহান", "চাণক্য", এবং "ঔরংজেবের" চরিত্র-সৃষ্টি অতুলনীয়। অন্যান্য অনেক চরিত্রেই তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রদর্শনে অসাধারণ শক্তির পরিচয় আছে; কিন্তু, "সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত" এবং "নুরজাহান" এই তিনখানি নাটকেই সেরূপ চরিত্রাঙ্কন বেশি। তিনি দুই একটি মাত্র দৃশ্যে অদ্ভুত মহত্ত্বের ছবি অঙ্কিত করিতে পারেন; যথা—সেকেন্দার, শেরখাঁ, সাহাবাজ, প্রভৃতি চিত্র। তিনি কখনো নাটকে হাস্য-রসোদ্ভাবনের জন্য কোনো বিদূষক-চরিত (যেমন সচরাচর যাত্রায় অথবা নিম্নস্তরের নাটকে দেখা যায়) অঙ্কন করিতেন না। নিত্য-কার স্বাভাবিক কথা এবং স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেই হাস্যরস জমাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; যেমন—বাচাল, পৃথ্বী সিংহ প্রভৃতি। কিন্তু, এ কথা বলিতে আমি বাধ্য যে, এ সকল হাস্য তেমন জমে নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সমূহ তিনভাগে বিভক্ত। সামাজিক,

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক। প্রহসন গুলিকেও তাঁহার সামাজিক নাটকের অন্তর্গত ধরিয়া লইলাম। তিনি প্রহসন লেখার উপলক্ষে সমাজ-সংস্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজের কোন্ কোণে, কোথায় কি গলদ্ রহিয়াছে, সূক্ষ্মরূপে তন্ন তন্ন করিয়াই তিনি তাহা দেখাইয়াছেন, এবং শুধু তাহা দেখাইয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই, —কৌশলে সে সকল সংশোধনের উপায়ো ইঙ্গিতে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক

কবি নীতি-শাস্ত্রের মূলসূত্রের মত সংক্ষেপে কেবল তত্ত্ব-কথার উপদেশ দান করেন না। বহুকালের চেষ্টায় এই স্থূল কথাটা এখন অনেকে বুঝিয়াছেন যে, যাহারা সমাজ-সংস্কারের জন্য কটীবদ্ধ হইয়া চীৎকার করে, অথবা কেবল বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসিয়া, আল্‌বোলার নল মুখে দিয়া দুঃখ প্রকাশ করে তাহাদের অপেক্ষা সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে কবি ও সাহিত্যিকের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, সংহিতাকার অপেক্ষা রামায়ণ-রচয়িতার দ্বারা জগতে কম উপকার সাধিত হয় নাই। কেবল নীরস শুষ্ক উপদেশে তেমন কাজ হয় না। বাল্যশিক্ষা নামক গ্রন্থেই আমরা "চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়', 'মিথ্যাকথা কহিও না' প্রভৃতি অনেক উপদেশ পাইয়াছি। কিন্তু, উপদেশটাকে যে পর্য্যন্ত দৃষ্টান্তদ্বারা জীবন্ত না দেখান যায় ততক্ষণ

উহা কেবল উপদেশ মাত্রেই পর্য্যবসিত থাকে, সহজে তাহা জীবনে পরিণত করিবার সুবিধা হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক সম্বন্ধে এস্থানে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিতেছি। কোন সামাজিক নাটক সমালোচনা করিতে হইলে কেবল ইহা দেখাইলেই চলিবেনা যে, নাট্যকার কিরূপ ভাবে সমাজকে গ্রহণ করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন; ইহাও আংশিকভাবে বিচার করিতে হইবে যে, অবস্থান্তর বিপর্য্যয়ে, নাট্যবর্ণিত ঘটনাপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ কিরূপভাবে তদীয় নাটকের ভিতরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। যাহা বাস্তব জগতে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান কেবল তাহাই না দেখাইয়া, যাহা ঘটিতে পারে, সুকৌশলে, সুসঙ্গত কার্য্যকারণ-ঘটনাপরম্পরার সমাবেশে, সেই কাল্পনিক আদর্শটিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলাই উচ্চ শ্রেণীর নাটকীয় কবিত্ব। আর, যাহা আছে কেবল তাহাকেই মধুর করিয়া দেখান 'চলনসই' কবিত্ব। প্রথমোক্ত কবিকে একপ্রকার দার্শনিক বা ভবিষ্যদ্বক্তা বলা যাইতে পারে।

বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন না হইলেও, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কবিদিগের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ আছে। কবির কল্পনা-লোক,—সেই বিচিত্র জগৎকে বাস্তবের মত ধরিয়া লইতে, তাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ

করিতে প্রচুর পরিমাণে চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। নাটক-সমালোচনার পক্ষে এই স্থূল অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়টি ভুলিয়াই কোন কোন সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্বন্ধে অনেক স্থলে আংশিক অবিচার করিয়াছেন। যখন যে পুস্তকখানি সমালোচনা করিতে হইবে, সমালোচ্য চরিত্র-গুলির বিচার সেই পুস্তকের বর্ণনীয় অবস্থা বা ঘটনাপরম্পরায় ভিতর দিয়াই করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সূর্যামুখী' বা সেক্সপীয়ারের 'হ্যাম্‌লেট, 'কিংলিয়ার' প্রভৃতি চরিত্র খুবি অসাধারণ সন্দেহ নাই;—কারণ, সেরূপ চরিত্র সচরাচর সুলভ বা সুপ্রাপ্য নহে;—কিন্তু, অসাধারণ হইলেই তাহা অস্বাভাবিক হয় না। অনেকে কোন চরিত্র একটু নূতন বা অসাধারণ হইলেই তাহাকে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বলিয়া বসেন;—তাই, এখানে এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

সমাজের অবস্থা পুরাতন কালে একরূপ ছিল, আর বর্ত্তমান অন্যরূপ এবং ভবিষ্যতে আর একরূপ হইবে। সমাজের অবস্থা নিত্যই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু, মানুষের চিত্তবৃত্তি কখনো রূপান্তরিত হয় না। চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া দেশকালপাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইলে তাহার ফল কিরূপ হয় তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। যেমন দয়াবৃত্তি দয়াবৃত্তিই থাকে, রূপান্তরিত হইয়া হিংসা বৃত্তিতে পরিণত হয় না। কিন্তু, দেশ-কাল পাত্র

বিশেষে দয়াবৃত্তির ক্রিয়া প্রযুক্ত হইলে আপাতত তাহার ফল হিংসা বা অন্য রূপ আর কোনো আকার ধারণ করিতে পারে। যেমন দয়া মানুষের একটি সাধারণ বৃত্তি, ইহা মানুষের চিরদিনি আছে ও থাকিবে; কিন্তু, হরিশ্চন্দ্রের মত দাতা একালে খুঁজিলে মিলিবে না। প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অবস্থান্তর বিপর্য্যয়ে মানুষের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক নাটক লিখিতে হইবে, এবং সমালোচকেরো বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেটুকু বুঝিয়া লইতে হইবে। নতুবা, আধুনিক সমাজে পুরাতন আদর্শ, এবং পুরাতন সমাজে আধুনিক আদর্শ অঙ্কন করিতে গেলে নাটক অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকের আদর্শগুলি একালের ছাঁচে গঠিত। এই সকল চরিত্র বুঝিতে হইলে, একালের মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে।

এজগতে "ইহা হইতে পারে", আর "উহা হইতে পারে না—" কেবল এরূপ কথা বলা যায় না; এবং কি কি হইতে পারে ও কি কি হইতে পারে না তাহার একটা সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়াও মোটেই সম্ভবপর নহে। দেখিতে হইবে যে, নাট্য-বর্ণিত ঘটনার সমাবেশে বর্ণিত চরিত্রকে কোন্ ভাবে পরিচালিত ও পরিণত করিয়াছে, এবং সেই পরিচালন বা পরিণতি নাট্য বর্ণিত অবস্থানুসারে সম্যক স্বাভাবিক হইয়াছে কিনা। নাটকীয় চরিত্রাঙ্কনের

স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা বুঝিবার এই একমাত্র উপায়।

নতুবা, কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি ও দেশ-কালের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহা অন্য জাতি বা দেশ-কালের পক্ষে অস্বাভাবিক বোধ হওয়া অসম্ভব নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু, দুঃখের বিষয়—কোন সমালোচনাই ঠিক যুক্তিযুক্ত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল "বিলাত ফেরত্", তিনি বঙ্গীয় সমাজের সহিত বিশেষ ভাবে মিশিয়াছেন কি না, প্রধানত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন কিরূপ ছিল,—এইসব নানা ভাব লইয়া সমালোচনা করিতে গিয়া ইহাঁরা কেবল বাজে তর্কই করিয়াছেন।

প্রহসন গুলির কথা বাদ দিলে, "পরপারে" নাটকি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ও শেষ সামাজিক নাটক। এই নাটকের প্রধান চরিত্র 'দাদামহাশয়ে'র চিত্র নিতান্তই অসাধারণ; কিন্তু, তথাপি ইহাকে আমরা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করি না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই তো অত্যন্ত অসাধারণ,—হ্যামলেট, কিংলীয়ার, লেডি ম্যাকবেথ, মীরাণ্ডা প্রভৃতি কোন চরিত্রই পথে-ঘাটে সচরাচর আমাদের চক্ষে পড়ে না;—কিন্তু, তা' বলিয়া এগুলিকে অস্বাভাবিক আখ্যা প্রদান করা কি সঙ্গত বা

যুক্তিযুক্ত হইবে? নিষ্ঠুর নিয়তি আর অবকাশ দিল না; নতুবা, দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্লভ প্রতিভা কালে যে তাঁহাকে সামাজিক নাট্যসাহিত্যেও উচ্চাসন প্রদান করিতে পারিত তাহা, অল্পাধিক ত্রুটি প্রমাদ সত্ত্বেও, এই 'পরপারে' পাঠ করিলেই আমরা দ্বিধাহীন নিশ্চয়তার সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

দ্বিজেন্দ্রলাল কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক, কি পৌরাণিক—কোন নাটকেই কেবল আদর্শ-চরিত্রই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পান নাই।

আদর্শ চরিত্রাঙ্কণ।

আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে নাট্যকারদিগের বহু মত আছে, এ প্রবন্ধে তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিবার স্থান নাই। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করা সহজ; কেহ কেহ এই জন্যই, যে নাটকে আদর্শ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তদপেক্ষা সাধারণ মানব-চরিত্র-বিশ্লিষ্ট নাটককেই উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন।

আদর্শ অঙ্কনের পদ্ধতি দুই প্রকার। কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ সৃষ্টি করেন, কেহ বা দোষ-গুণসমন্বিত মনুষ্য-চরিত্রেই কোন একটি বা দুইটি মাত্র উচ্চ প্রবৃত্তি—বর্ণনীয় চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতসঙ্কুল জীবনের জটিল গতির মধ্য দিয়া—কিরূপ ভাবে বিকশিত হইল, কেবল তাহাই দেখাইতে চাহেন। এই বিভিন্ন প্রকার চরিত্র সৃষ্টির তারতম্য বা তুলনা করিতে পারা যায় না। ইহার প্রত্যেকটিই এক এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু, মানুষ কখনো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ হইতেই পারে না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ—একমাত্র শ্রীভগবান। সুতরাং, মানুষকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আদর্শ রূপে চিত্রিত করিতে গেলে উহা একান্তই অস্বাভা-বিক হইয়া পড়িবে। সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য মনুষ্যের অস্তিত্ব কল্পনা-তেই সম্ভব। সাধারণত দোষগুণের মিশ্রণেই মানব-চরিত্র গঠিত। দুই চারিটা ভুলভ্রান্তি আছে বলিয়াই মানুষ "মানুষ"; তবে কি না—এক এক ব্যাক্তি অবশ্য এক এক বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় হইতে পারেন। যিনি স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তিনিই যথার্থ উচ্চস্তরের কবি। দ্বিজেন্দ্রলালের এ ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল। তিনি 'মেবার পতনে' মহাবাৎ খাঁর চরিত্রে আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণতা, প্রতাপ সিংহে আদর্শ স্বদেশ-ভক্তির দৃঢ়তা, হেলেন চরিত্রে আদর্শ প্রেম ও আত্মত্যাগ, চন্দ্রকেতুতে আদর্শ বন্ধু-প্রেম, কাশীমে প্রভুভক্তি প্রভৃতি নানা ভাবের মধ্য দিয়া মনুষ্য চরিত্রের নানা প্রকার মহত্ত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন।

তিনি একমাত্র দুর্গাদাসের চরিত্রকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যাইয়া তাহাকে একটু অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। এই দুর্গাদাস চরিত্রের কোন স্থানেই ত্রুটি বা পতন দেখানো হয় নাই। অন্তত দুই এক স্থানে একটু পদস্খলন ঘটিলে সম্ভবত চরিত্রটি স্বাভাবিক হইত।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা বালুবেলা-মধ্যবাহী নদীধারাবৎ অনায়াস-

গামিনী ও স্ফটিক-স্বচ্ছ। তাঁহার ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বেদনায় বিকম্পিত, আবেগে আন্দোলিত। একটা সতেজ, সরল ভাবের অনুপ্রাণনা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন স্থানে তাঁহার ভাষা শুনিতে একটু ইংরাজী তর্জ্জমার মত; কিন্তু, এ অভিনব ভাষা নাট্যসাহিত্যের পক্ষে অনেক সময়ে বড়ই উপযোগী। এই ভাষার বাঁধুনির নূতনত্বে তাঁহার নাটক অভিনয়ের পক্ষে বড়ই সুবিধাকর। অনেক স্থলেই তিনি প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—যেখানে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ পাওয়া যাইতে পারে, সেখানে অকারণ দুর্ব্বোধ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার আদৌ আবশ্যকতা নাই। বস্তুত তাঁহার ভাষা যেমন মার্জ্জিত, প্রাঞ্জল ও মধুর তেমনি সরল, শোভন ও সতেজ।

ভাষা।

দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু অজ্ঞবিজ্ঞ এবং স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি সকলের ভাষার বিভিন্নতা রক্ষা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে তিনি নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির মুখ দিয়াও সাধুভাষা প্রয়োগ করাইয়াছেন। এইটুকু না হইলে তাঁহার নাটকের ভাষা সম্পূর্ণই নির্দ্দোষ হইত। নাট্য-সম্রাট্ দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের এই গুণ আছে।

তাঁহার উপমা-প্রয়োগ বঙ্গসাহিত্যে অভিনব ও অতুলনীয়। কিন্তু, স্থানে স্থানে অনাবশ্যক উপমাপ্রাচুর্য্যে রচনা ভারাবনত হইয়া

পড়িয়াছে। অল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশ করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার উপমা প্রত্যক্ষ অর্থের দ্বারা যতটা ভাব ব্যক্ত করে তদপেক্ষা অনেক অধিক ভাব কল্পনায় জাগাইয়া তোলে।

সংক্ষেপে কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া, এ প্রবন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্যই অসম্পূর্ণ থাকিতে লেখনী বন্ধ করিতে হইল। আশা করি—ভবিষ্যতে অনুকূল অবসরে বিস্তৃতরূপে এবিষয়ে আরো আলোচনা করিতে সমর্থ হইব।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের ভিতরে জ্যোৎস্নার মত মৃদুল আবেশে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছিলেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায়,—উজ্জ্বল, দীপ্ত, জ্বালাময় প্রতাপে। দ্বিজেন্দ্রলাল বসন্তের পিকের মত ললিত উচ্ছাসে কুঞ্জবনে গীত গান নাই, তিনি গাহিয়াছেন পাপিয়ার মত প্রবল, গম্ভীর, উদাস স্বরে—ঐ উন্মুক্ত, উদার নীলাকাশে! দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব কতকটা বর্ষার আকাশের মত,—তাহাতে গর্জ্জন আছে, বিদ্যুৎ আছে, বর্ষণ আছে; তাঁহার কবিত্ব যেন হিমাচলের ন্যায়—তাহাতে গাম্ভীর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে, মহিমা আছে, বন্ধুরতাও আছে; আবার তাঁহার কবিত্ব সমুদ্রেরি মত—তাহাতে তরঙ্গ আছে, আলো আছে, ছায়া আছে, এবং অসীমতায় তাহা দুলিয়া দুলিয়া এক একবার কাঁপিয়া ওঠে!

উপসংহার

এতক্ষণে আমরা তাঁহার কাব্য ও নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। এক একটি কুসুম ছিঁড়িয়া যেমন উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখানো যায় না, এক একখানি ইষ্টক আনিয়া যেমন একটি প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দেখানো যায় না, তেমনি একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। সম্যক্‌রূপে রসাস্বাদন করিতে হইলে তাঁহার কাব্য ও নাটক নিবিষ্ট মনে পড়িতে হইবে, এবং পড়িয়া তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

আজ বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান-নির্দ্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে। সহৃদয় বিদ্বন্মণ্ডলী আশা করি—আমাদের জাতীয় গৌরব দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া আর আত্ম-বঞ্চিত হইবেন না।

উপসংহারে, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত নিবেদন এই যে, যদি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোনো অশোভন, অসংযত অথবা অসঙ্গত কথা বলিয়া থাকি, মনীষিগণ নিজগুণেই তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আমার তুচ্ছ প্রবন্ধ যদি এক ব্যক্তিকেও কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তবেই, বলা বাহুল্য—ইহা চরম সাফল্য লাভ করিয়াছে মনে ভাবিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিব।

বরিশাল-শাখা-পরিষৎ-

সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

(১)

"সেবা"—(প্রথম খণ্ড)

পরিষৎ-শাখায় পঠিত কতিপয় সারবান প্রবন্ধ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

(ছাত্রগণের জন্য অর্দ্ধ মূল্য।)

(২)

"চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস"

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড প্রণীত

মূল্য ১৲ এক টাকা।

(ছাত্রগণের জন্য অর্দ্ধ মূল্য।)

(৩)

"চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ"

৺ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত

ও

শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত বসু বি এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ।০ চারি আনা।

(৪)

"উৎসব"

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মূল্য ।০ চারি আনা।

(৫)

"চিন্তা-লহরী"

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি এল প্রণীত

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল-শাখা-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,

"প্যারাগন প্রেস" হইতে

শ্রীসূর্য্যকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।